

ডাকমা

পরিচিতি



৫৫৮৪(১)

ডাকমা



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

চাকমা পরিচিতি

১ম সংস্করণ

অক্টোবর ১৯৮৩ইং

রাঙ্গামাটি

CHAKMA PARICHITI

by **Sugata Chakma**

Published by **Bargang Publications**

1st Edition : October, 1983

Rangamati

BANGLADESH

প্রকাশক : **সুদত্ত খীসা**

বরগাঙ পাবলিকেশন্স

রাঙ্গামাটি

মুদ্রক : **কালী শঙ্কর দেওয়ান**

সরোজ আর্ট প্রেস

রাঙ্গামাটি

বিনিময় মূল্য--পঁচিশ টাকা

সূচীপত্র :

বিষয়	পৃষ্ঠা
চাকমা পরিচিতি	১—২
ইতিহাস ও ইতিকথা	২—৪৭
সমাজ ও সংস্কৃতি	৪৮—৮০
ভাষা ও সাহিত্য	৮১—১৩২

প্রকাশকের কথা

মানুষ চিরকালই নিজের পরিচয় জানতে চায়। সে ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যে জাতিই হোকনা কেন সবারই একটা পরিচয় রয়েছে। তাই মানব সভ্যতার ইতিহাসে হরফ—যেদিন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেদিন থেকেই মানুষ সোনালী আখরে তার অতীত ইতিহাস এবং ধ্যান-ধারণাকে লেখনীতে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছে। তাই অতীতের বহু মহৎ ধ্যান-ধারণা, সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান জগতকেও প্রভাবান্বিত করেছে। আর সে মহতী পরশে সৃষ্টি হচ্ছে আজকের বিশ্বের অনেক নতুন ইতিহাস।

যে কোন জাতির ভাষা, সাহিত্য, সমাজ এবং সংস্কৃতিতে সে জাতির পরিচয় মেলে। চাকমাদের সমাজ সংস্কৃতিতেও তাদের অতীত জীবনের ছাপ রয়েছে। অনেকে উক্ত বিষয়ের উপর নানা বই লিখেছেন। এগুলির মধ্যে চাকমা জাতি চাকমা রাজবংশের ইতিহাস, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত বইগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু হুঃখের বিষয় বর্তমানে ঐসব বই আর পাওয়া যায়না। আর শেষোক্ত বইটি প্রকাশের পর আজ পর্যন্ত বহু সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ের উপর আর কোন নতুন বই প্রকাশিত হয়নি।

ইতিমধ্যে কতিপয় গবেষকের প্রচেষ্টায় চাকমাদের ইতিহাস ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সে সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচ্য বইয়ের লেখক তাঁর “চাকমা পরিচিতি”-তে আলোকপাত করেছেন। আর এই নতুন তথ্যাদির আলোকে “চাকমা পরিচিতি” বইটি পাঠক সাধারণের হাতে তুলে দেওয়ার জন্তে “বরগাও পাবলিকেশন্স” এর পক্ষ থেকে এটি প্রকাশ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে—

শুভেচ্ছা।

চাকমা, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য পুস্তকের অভাব অনেকদিন থেকে অনুভূত হয়ে আসছে। স্বদেশী ও বিদেশী বৈশিষ্ট্য কিছু সংখ্যক লেখকের এ সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হয়ে থাকলেও বিষয়গুলি সর্বক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেক জ্ঞান ও পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির অভাবে এগুলি নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেনি।

“চাকমা পরিচিতি” নামে শ্রীমান সুগত চাকমার প্রকাশিত পুস্তক এই অভাব অনেকাংশে দূর করবে বলে আমার বিশ্বাস। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও একজন স্বজাতীয় লেখকের রচনা এক্ষেত্রে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্যতার দাবী রাখে।

অজ্ঞাত প্রসঙ্গাদির কথা বাদ রেখে এখানে চাকমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। স্বীকার করতে হবে যে চাকমা জাতির অতীত ইতিহাস এখনও ঘোর ভ্রমসম্ভব। দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিজাতীয় লেখক-গণের হাতে সৃষ্ট এই ইতিহাস বর্তমান দিনের গবেষণা এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে আজ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

“The Chakmas are undoubtedly of Arakanese origin— (Hutchinson 1909)” এই একটি অলীক ধারণার বশবর্তী হয়ে বর্মী ইতিহাসের সংগে অতীত চাকমা ইতিহাসকে যেভাবে তাঁরা গুলিয়ে ফেলেছেন হুঃখের বিষয় অনেক স্বজাতীয় লেখকও সেই মিথ্যা ধারণায় আচ্ছন্ন থেকে আজ পর্যন্ত একই ধারার অনুবৃত্তি সাধন করে চলেছেন এবং কালক্রমে নানা ভাবে ইতিহাসের এই জটিল গ্রন্থিকে আরও জটিলতর করে ফেলেছেন। অনেকে আবার বর্মা-আরাকানের সীমানা পেরিয়ে শ্রাম-কাম্বোজের মাটিতে নিজেদের প্রাচীন ইতিহাসের সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু আজকের দিনের গবেষণা এই জোর করে ঘোরানো ইতিহাসের কম্পাস কাঁটাটিকে এর সঠিক দিক অর্থাৎ উত্তর দিকই নির্দেশ করছে। এক লোকের সঠিক অবস্থানটি যদিও এখনও পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি তবুও এর বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিগুলি যে বরাবরই উত্তর দিক থেকে আসছে এতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীমান সুগত চাকমার বর্তমান পুস্তকে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দেওয়া না হলেও

এ বিষয়ের আলোচনায় একটি মূল্যবান দিক নির্দেশিকা রয়েছে। শতাব্দী লালিত একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন অবশ্যই হওয়া উচিত।

প্রচলিত ইতিহাসের বহু তথ্যগত ভ্রান্তির একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করলেই পাঠকদের অনুধাবন করার পক্ষে যথেষ্ট যে ইতিহাসের কোন্ অন্ধ চোরাগলিতে এখনও আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। ব্রহ্মসম্রাট তরুণ্য কঠক চট্টগ্রামের ইংরেজ শাসককে লিখিত একটি মাত্র চিঠিকে সম্বল করেই এবং ন্যূনতম সমীক্ষা ছাড়াই স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর “চাকমা জাতি” গ্রন্থে উক্ত চিঠিতে উল্লেখিত সিরিত্তমাকে একজন স্নানামধ্য চাকমা রাজা বলে নির্দিষ্ট করে চালায়ে দিয়েছেন এবং পরবর্তী ইতিহাসকারগণ রঙীন তুলিকা বুলিয়ে এই কাল্পনিক চিত্রকে আরও মোহনীয় করে তুলেছেন। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয়, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত “Bengal District Records” গ্রন্থে লুইন উদ্ধৃত Sery-tumah Cuckah কে এক খোঁচায় Sery-tumah chuckmah বানিয়ে ঐতিহাসিক জগাখিছড়ির চুড়ান্ত করে ছাড়া হয়েছে। অথচ আজ পরিস্কার হয়ে এসেছে যে আরাকানের কীতিমান রাজা শ্রী সুধম্মা, যার ধর্ম পরায়নতা এবং বিবিধ গুণগানের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই শ্রী সুধম্মাই উক্ত চিঠিতে উল্লেখিত Sery tumah। দেড়শ বছর পরেও যার অম্লান স্মৃতি সম্ভবতঃ ব্রহ্মরাজকে ঐ চিঠিতে উল্লেখ করতে প্রবুদ্ধ করেছিল। একটি উদ্ধৃতি :—

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাংগ নগরী নাম স্বর্গ-অবতারী ॥
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার ॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥
দেবগুরু পূজা ধর্মেত তার মন।
সে পদ দর্শনে হএ পাপের মোচন ॥
পুণ্যফলে দেখ যদি রাজার বদন।
নারকিএ স্বর্গ গাএ সাফল্য জীবন ॥

(সতীময়না : দৌলতকাজী)

তরুমার দীর্ঘ চিঠির অধিকাংশই এ পুস্তকে উদ্ধৃত হয়নি। তার একটি জায়গায় আছে :— “At this time one Budda Dutta, otherwise, Seery Boat Thakoor, came down in the country of Arracan, and instructed the people and the beasts in the principle of religion and rectitude.....do you enforce laws and customs of Seery Boat Thakoor, which I accordingly did.....conformed myself strickly to the laws and customs of Sery-tumah Cuckah. (Cuckah শব্দটি সম্ভবতঃ ভুল প্রতিবর্ণীকরণ এটি সম্ভবতঃ “শাহ”, যে উপাধি তিনিসহ তৎপূর্ববর্তী ১৪ জন আরাকানী রাজা লহণ করেছিলেন।)

এই Seery Boat Thakoor ছিলেন আরাকান রাজ্যের বিচক্ষণ মহামাতা শ্রীবড় ঠাকুর, “চন্দ্রাবতী কাব্য” প্রণেতা এবং অশ্রুতম মন্ত্রী মগন ঠাকুরের পিতা, যার প্রশংসায় আলাওল পঞ্চমুখ। আলাওলের ছুটি উদ্ধৃতি :—

“রাজ্যপাল সৈন্য-মন্ত্রী আছিলেন তাত।

শ্রীবড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত ॥”

(সয়ফুল মলুক)

“রাজসৈন্য মন্ত্রী ছিল শ্রীবড় ঠাকুর।

প্রভুত মাগিয়া পাইল কুলদীপ শুর।”

(পদ্মাবতী)

সিরিস্তমার পরে “দেংগাওয়াদী আরেদকুং” থেকে চয়ন করা ইয়ংজ থেকে মারিকাজ পর্যন্ত পরবর্তী কাহিনীও চাকমা ইতিহাসের মধ্যে একটি অত্যন্ত ভ্রমাত্মক এবং মারাত্মক প্রক্ষেপ বলে আমি মনে করি। স্থানাভাবে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হলোনা।

আমি আশা রাখি পুস্তকটি সুধী মহলে সমাদৃত হবে।

তাং—৪ | ১০ | ১৯৮৩ ইং

রাঙ্গামাটি

অশোক কুমার দেওয়ান

পরিচালক

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে এবং বিদেশে চাকমাদের সম্পর্কে জ্ঞানার আগ্রহ দিন দিন বেড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্পর্কে জ্ঞানার আগ্রহ বাড়লেও পড়ার মত বাজারে কোন বই পুস্তক পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ হলো এ অঞ্চলে লেখকের অভাব এবং যে কয়জন একটু আধটু লেখেনও ঐ লেখাগুলি বইয়ের আকারে প্রকাশের সামর্থ্য তাঁদের নেই। বিশেষতঃ এখানে এ ধরনের বই প্রকাশ করার জন্য কোন প্রকাশক নেই এবং লেখকদের পক্ষেও এই দুর্মূল্যের বাজারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন বই প্রকাশের ব্যয়-ভার বহন করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া আরও একটি অশুবিধা হলো এখানকার উপজাতীয়দের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা জানা গেলেও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না; এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে এ বিষয়ে কোন লেখকের পক্ষে বেশীদূর এগুনো সম্ভব নয়।

সৌভাগ্য বশতঃ সাম্প্রতিক কালে কিছু সংখ্যক গবেষকের ঐকান্তিক এবং নিরলস প্রচেষ্টার ফলে চাকমাদের দু'চার শ' বছরের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্যাদি জানা যাচ্ছে। যার ফলে এ অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কেও কিছুটা জ্ঞানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এখানকার উপজাতীয়দের সম্পর্কে প্রথম যিনি বই লেখেন, তিনি হলেন Captain T. H. Lewin। তাঁর বইটির নাম ছিল The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein; বইটি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তৎপরে R. H S. Hutchinson সাহেব ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে An account of Chittagong Hill Tracts নামে আরও একটি বই লেখেন। উল্লেখিত দু'জন লেখকের বইয়ে এখানকার উপজাতীয় লোকদের তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যাদি জানা যায়।

বাংলায় প্রথম বই লেখেন শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ; তাঁর বইটির নাম ছিল, “চাকমা জাতি”। উক্ত বইয়ের লেখক হিসেবে পরবর্তীকালে তিনি দেশে বিদেশে বহু সম্মানের অধিকারী হন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বইটিতে চাকমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। উক্ত বইটিতে কর্তব্য কর্মের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার স্বাক্ষর রয়েছে।

লুইন চাকমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এগুতে সক্ষম হন। তিনি চট্টগ্রামস্থ কমিশনার অফিসের রেকর্ডপত্রকে সম্বল করে ঐ পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। এরপর অনেক চেষ্টা করেও লুইন আর বেশীদূর এগুতে পারেননি। যদিও পরবর্তীকালে চাকমাদের সম্পর্কে ইংরেজী ও ফারসীতে লেখা আরও অনেক কাগজপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু লুইন ঐ সমস্ত কাগজপত্র-গুলি না পাওয়ায় ঐগুলি তাঁর বইয়ে স্থান পায়নি।

লুইনের পরে চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে বই লেখেন শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ ; সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রী ঘোষের চাকমাদের সম্পর্কে নির্ভর-সোগ্য সূত্র ছিল “দেঙ্গাওয়াদী আরেদ ফুং” নামে আরাকানী ভাষায় লেখা একটি ইতিহাস বই। ঐ বইয়ে “সাক” নামে একটি জাতির ইতিহাস রয়েছে। শ্রী ঘোষ ঐ বইয়ের সাকদের ইতিহাসকে চাকমা ইতিহাস হিসেবে তাঁর বইয়ে স্থান দেন। এর কারণ হলো বর্মী এবং আরাকানীরা কোন অজ্ঞাত কারণে চাকমাদেরকে এখনও “সাক” বা “থেক” বলে থাকে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে বর্মী এবং আরাকানীরা চাকমাদেরকে বাদেও আরও কয়েকটি জাতিকে “সাক” নামে অভিহিত করে। এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের “চাক” বা ‘আসাক’দের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে চাকমা এবং চাকদের মধ্যে ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও নানাবিধ বিষয়ে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। তাই সাক্ হলেই সে যে চাকমা হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

এ সম্পর্কে প্রথম সন্দেহ পোষণ করেন শ্রদ্ধেয় শ্রী অশোক কুমার দেওয়ান। ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত “উপজাতি গবেষণা পত্রিকা” ১ম সংখ্যায় “চাকমা জাতির ইতিহাসে অষ্টাদশ

শতক" নামে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে নূতন ধ্যানধারণার সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে চাকমাদের ফলে দীর্ঘ ষাট বছর (১৯০৯-১৯৬৯ ইং) ধরে প্রচলিত সাক চাকমা পিঁড়ী গুরুতর রূপে সন্দেহের মুখোমুখী হয় এবং এর ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে Joa de Barros নামে জনৈক পর্তুগীজের আঁকা একটি মানচিত্রে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে Chacomias নামে একটি অঞ্চলের অবস্থান জানা যায় এবং একই সাথে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের দিকে আরাকান রাজ্যের একটি ঘোষণা থেকে উক্ত অঞ্চলটি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এতে চাকমা এবং চাকমারাজ্য সম্পর্কে ধীরে ধীরে হলেও সত্যিকার কিছু ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়। বলা বাহুল্য এ সম্পর্কে প্রায় তথ্যাদিও খ্রীদেওয়ান আবিষ্কার করেন।

চাকমাদের গবেষণার পাশাপাশি তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে গবেষণা চলতে থাকায় তাদের অতীতের ধ্যানধারণা, সমাজব্যবস্থা এবং জীবনপ্রণালী সম্পর্কেও বহু তথ্য জার্মা গেছে। এতে দিন দিন একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে চাকমারা বর্মী কিংবা আরাকানী বংশোদ্ভূত নয় এবং কোন কালেও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল না। পক্ষান্তরে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে চাকমা পূর্ব ভারতবর্ষেরই লোক; কোন একসময় অতীতে আসাম-ত্রিপুরার দিক থেকে এদিকে এসেছিল। তবে সে ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত।

বর্তমানে খ্রীদেওয়ান চাকমা ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। তাঁর বিশ্বাস ভাষাতত্ত্বের আলোকে চাকমারা দু'দলে এদিকে এসেছিল বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ এতে প্রথম দলে তঞ্চঙ্গ্যারা এবং দ্বিতীয় দলে চাকমারা উত্তরদিক থেকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল। পরে তঞ্চঙ্গ্যাদেরই একটি দল কোন না কোন কারণে আরাকানে চলে যায়; যারা পরবর্তীকালে সেখানে দৈংনাক নামে পরিচিত হয়েছে।

এটা সত্য যে চাকমাদের অতীত ইতিহাস এখনও গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক গবেষণা এবং নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হলে হয়তো একদিন চাকমাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে।

এই বইটিতে চাকমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি সাধারণ পাঠকদের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। এ বিষয়ে যারা অধিক জ্ঞানতে আগ্রহী তাঁরা শ্রীযোষের “চাকমা জাতি” এবং শ্রীবিরাজ মোহন দেওয়ানের “চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত” বই দু’টি পড়তে পারেন। এ ছাড়া এ বইটিতে চাকমাদের শিক্ষা, কৃষি, অর্থনীতি ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর লেখকের পক্ষে আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাঠকদের মধ্যে চাকমাদের সম্পর্কে জ্ঞানার আগ্রহ বেড়েছে। কিন্তু বাজারে এ সম্পর্কে যারা অল্প স্বল্প লেখেছেন তাঁদের বইগুলিও বর্তমানে দুর্বল এবং পুনঃ প্রকাশনার অভাবে এখানে আর পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় পাঠকদের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমার এই বইটি লেখার শুরু।

বর্তমান বাজারে কাগজপত্রের মূল্য যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে, তাতে আমার এই বইটি প্রকাশের সম্ভাবনা একপ্রকার ছিলনা বললেই চলে। কিন্তু এই দুঃসময়ে আমার তরুণবন্ধু শ্রীমান সুদত্ত খীসা গভীর আন্তরিকতা এবং উৎসাহ নিয়ে এই বইটি প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার এবং দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমার এ বইটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাই এই বইটি প্রকাশের যাবতীয় কৃতিত্ব শ্রীখীসার। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে এবং মুদ্রণ প্রমাদের কারণে বইটিতে বহু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। আমি এ জ্ঞাত পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আশাকরি সুধী সমাজ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিগুলি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন। এই বইটি পড়ে কেউ যদি উপকৃত হন, তবে আমি আমার এই বইটি লেখার শ্রমকে সার্থক মনে করবো।

চাকমা পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে গিরি, নিঝরিণী, হুদ এবং অরণ্যের মায়াবী পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা তার অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা ও বৈচিত্র্যময় উপজাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির জন্ম দেশী এবং বিদেশী সকল শ্রেণীর পর্যটক ও পাঠকের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে আছে। এখানে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ছো, পাংখোয়া, খুমি, বোম, চাক, খিয়াং, রিয়াং, লুসাই, উমুই, প্রভৃতি উপজাতীয় লোকের বসবাস। বাংলাদেশের মানচিত্রে খাগড়াছড়ী ও বান্দরবনসহ এ জেলার অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের ২১°২৫' থেকে ২৩°৪৫' এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯১°৪৫' থেকে ৯২°৫২'। মোট আয়তন ৫০৮৯ বর্গমাইল।

এখানে বসবাসকারী উপজাতীয়দের মধ্যে জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের দিক থেকে চাকমাদের নাম বহুল পরিচিত। আনুমানিক প্রায় তিনলক্ষ চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যাসহ) এ জেলায় বাস করে। ভারতেও চাকমা রয়েছে। সেখানে প্রায় লক্ষাধিক চাকমা অরুণাচল, মিকিরহিল, ত্রিপুরা এবং মিজোরামে বাস করে। মিজোরামে চাকমাদের জন্ম একটি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলও রয়েছে। এছাড়া বার্মায় চাকমাদের দৈংনাক নামে আরও একটি দল আছে যাদের জনসংখ্যা আনুমানিক পঞ্চাশ হাজারের উর্ধ্বে হতে পারে।

নৃত্যের বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। মুখমণ্ডল গোলাকার, গোলাপী ওষ্ঠাধর, চোখের মণি কাল, দেহের রং হলদে, চুলগুলি সোজা, দাড়ি গোঁফ কম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক Sir Risely সাহেব Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে চাকমাদের মধ্যে শতকরা

৮৪ ৫ জনের চেহারা মঙ্গোলীয় বলে মন্তব্য করেছেন।^১ আর দ্বিজলী সাহেবের পর এষাবতকাল পর্যন্ত কেউ আর সে বিষয়ে বিজ্ঞান সন্মতভাবে গবেষণা না করায় অন্য কোন নৃতাত্ত্বিকের মতামত দেওয়া সম্ভব হলো না।

ইতিহাস ও ইতিকথা :—

চাকমাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে চাকমাদের ভাষা, লোকগীতি, গল্প কাহিনী, খেলা-ধূলা ও এষাবতকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের আলোকে চাকমারা বেশ কয়েক শত বছর ধরে চট্টগ্রামের আশে পাশে বসবাস করছে বলে মনে হয়।

ইতিমধ্যে অনেক লেখক চাকমা রাজ্যের সন্নিকটে আরাকানের অবস্থান, চাকমা বর্ণের সাথে আরাকানী বর্ণের সাদৃশ্য, উভয় অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ইত্যাদি লক্ষ্য করে চাকমাদের বর্মী অথবা আরাকানী বংশোদ্ভূত বলে মনে করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে চাকমাদের বর্মী দক্ষিণের আরাকানী বর্ণমালার সাথে নয় বরঞ্চ উত্তরের অহোমদের পুরাতন বর্ণমালার সাথে একই পরিবারভুক্ত। আর চাকমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পূজা-পার্বন, উৎসব, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতিনীতি ইত্যাদির সাথে বর্মী ও আরাকানীদের এতবেশী অমিল যে চাকমারা কোন অবস্থাতেই বর্মী ও আরাকানী বংশোদ্ভূত হতে পারেনা; বরঞ্চ ঐগুলির সাথে আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতীয়দের সাংস্কৃতিক মিল দেখা যায়। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে চাকমারা আসাম-ত্রিপুরার দিক থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে এসেছিল।

আদি বাসস্থান সম্পর্কে চাকমাদের ধারণা অতীতে তারা উত্তরে কোন এক চম্পকনগর নামক রাজ্যে বাস করতো। সেখান থেকে তারা ক্রমে ক্রমে কালাবাঘা (শ্রীহট্ট ?) ও চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান পর্যন্ত যায়। পরে আরাকানী-

১. সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি (১৯০৯ ইং), পৃ: ৩

Risely, Tribes and Castes of Bengal, P 168.

দের অত্যাচারে পুনরায় চট্টগ্রাম হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে পড়ে। এ সম্পর্কে “চাদিগাও ছারা” নামে চাকমাদের একটি ঐতিহ্যবাহী পালাগান আছে। তাতে নিম্নলিখিত কিংবদন্তীটি পাওয়া যায়, —

অতীতে চাকমারা চম্পকনগর নামে কোন এক রাজ্যে যখন বাস করতো তখন বিজয়গিরি নামে সে রাজ্যের একজন যুবরাজ সাত চমু: (প্রায় ছাঞ্চিশ হাজার) সৈন্য নিয়ে দক্ষিন দিকে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান জয় করেন। এরপর তিনি ফিরার পথে চট্টগ্রামে এসে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। ঐ সময় তাঁর অবর্তমানে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমর-গিরি সি হাসনে আরোহন করেছিলেন। এ সংবাদ শুনে তিনি খুব মর্মান্বিত হয়ে সসৈন্যে দেশে আর না ফিরে বিজিত রাজ্যে রাজত্ব করার মনস্থির করেন। তিনি আরাকানের দিকে রওনা হন এবং সাপ্রে-কুল নামক স্থানে গিয়ে তাঁর অনুগত সৈন্যদের সেখানে বসবাসের ও স্থানীয় রমনী বিয়ে করার অনুমতি দেন। কালে তাদের সাথে চম্পকনগরের সম্পর্ক হিন্ন হয়ে যায়। চাকমাদের ধারণা তারা বিজয়গিরির সেই আরাকান বিজয়ী সৈন্যদেরই বংশধর।

চাকমারা কাগজে পত্রে চাকমা (CHAKMA) নামে পরিচিত হলেও নিজেদের মধ্যে তারা চাংমা (Changma) নামে পরিচয় দেয়। বর্মীরা চাকমাদেরকে বলে সাক্ (Sak) বা থেক্ (Thek)। কুকি-চীন ভাষা পরিবারভুক্ত লুসাই, পাংখোয়া ও বোমরা চাকমাদেরকে বলে তাকাম্। তাই চাকমাদের আদি নামটি কি হতে পারে তা' গবেষণার বিষয় তবে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে চাকমারা যে বর্তমান নামটি দিয়ে পরিচিত হচ্ছে তা এক প্রকার নিশ্চিত বলে মনে হয়। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে Joao De Barros নামে জনৈক পর্তুগীজের আঁকা একটি মানচিত্রেই সর্বপ্রথম কর্ণফুলী নদীর পূর্বতীরে হু'টি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে CHACOMAS (চাকোমাস্) নামে একটি রাজ্য ছিল বলে জানা যায়।^২ উল্লেখিত মানচিত্রে আইহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ পূর্বে এবং আরাকানের উত্তরে Chacomass এর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. Dr. Abdul Karim, Samandar of the Arab Geographers, Journal of the Asiatic Society of Pakistan (1963), Vol—VIII, No. 2, P. 25

এই রাজ্যটি বিভিন্ন সময়ে স্বাধীন থাকলেও Philip de Brito Nicote নামক জনৈক পর্তুগীজ নাবিককে লেখা আরাকান রাজার একটি চিঠি থেকে জানা যায় ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে এটি আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। ঐ চিঠিতে আরাকান রাজা নিজেকে “the highest and the most powerful King Arakan, of Chacommas and of Bengal” বলে পরিচয় দিয়েছেন।^৩

চাকোমাস্ রাজ্যটি আরাকানের শাসনাধীনে যাওয়ার পূর্বে সম্ভবতঃ ঐ রাজ্যের সাথে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ছিল। ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থ রাজমালায় চাকমা ও চাখমা শব্দ দুটি পাওয়া যায়। ১৫৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দের দিকে আরাকান রাজা Meng Beng যখন বার্মার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন আরাকানের উত্তর দিকস্থ ত্রিপুরার দিক থেকে একজন Sak রাজা আরাকান আক্রমণ করে রামু পর্যন্ত জয় করেছিলেন। এ সম্পর্কে General Sir Arthur P. Phayre কর্তৃক লিখিত History of Burma (1883) গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত তথ্যটি পাওয়া যায়। “While Meng Beng was thus engaged, an enemy had appeared from the north called in Arakanese history the Thek or Sak King by which term the Raja of Tippera appears to be meant He had penetrated to Ramu.”

বর্মী ও আরাকানীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের “চাকমা” এবং “চাক” উভয় উপজাতিকেই Sak বলে থাকে কাজেই উক্ত Sak King শব্দ যোগে চাকমা অথবা চাক কাকে বোঝানো হয়েছে চিন্তার বিষয়। তবে ঐ সাক রাজ্যটি যদি কোন চাকমা রাজ্য হয়ে থাকেন তবে ঐ সময় চাকমারা আরাকান আক্রমণ করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণে বান্দরবান জেলায় রামু থানাতে অতীত “চাকমা-কুল” নামে একটি স্থান রয়েছে। উক্ত স্থানের অনতিদূরে বুড়ামুরি, গাভুর মুরি, পাগালা মুড়া প্রভৃতি নদী ও পাহাড়ের নাম থেকে সহজেই অনুমেয় চাকমারা ইতিপূর্বে ঐ স্থানে বসবাস করেছিল। উল্লেখ্য “পাগালা

৩. Journal of the Asiatic Society of Pakistan (1967)
Vol-XII, No. 3, P. 44.

The following account of the Chākṃā alphabet is based on information provided by Dewan Kristo Chandra, a gentleman of Chākṃā nationality, and forwarded to me by Mr. J. A. Cave-Browne, Assistant Commissioner, Chittagong Hill Tracts.

The Chākṃā alphabet is as follows:—

ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ
kā	khā	gā	ghā	nā
ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ
chā (sā)	chhā	jā	jhā	ñā
ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ
ta	thā	dā	dhā	nā
ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ
tā	thā	dā	dhā	nā
ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ
pā	phā	bā	bhā	mā
ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ
yā	rā	lā	ṁ	shā
ṁ	ṁ	ṁ	ṁ	ṁ
hā	hlā	ā		

Bengali.

২৭

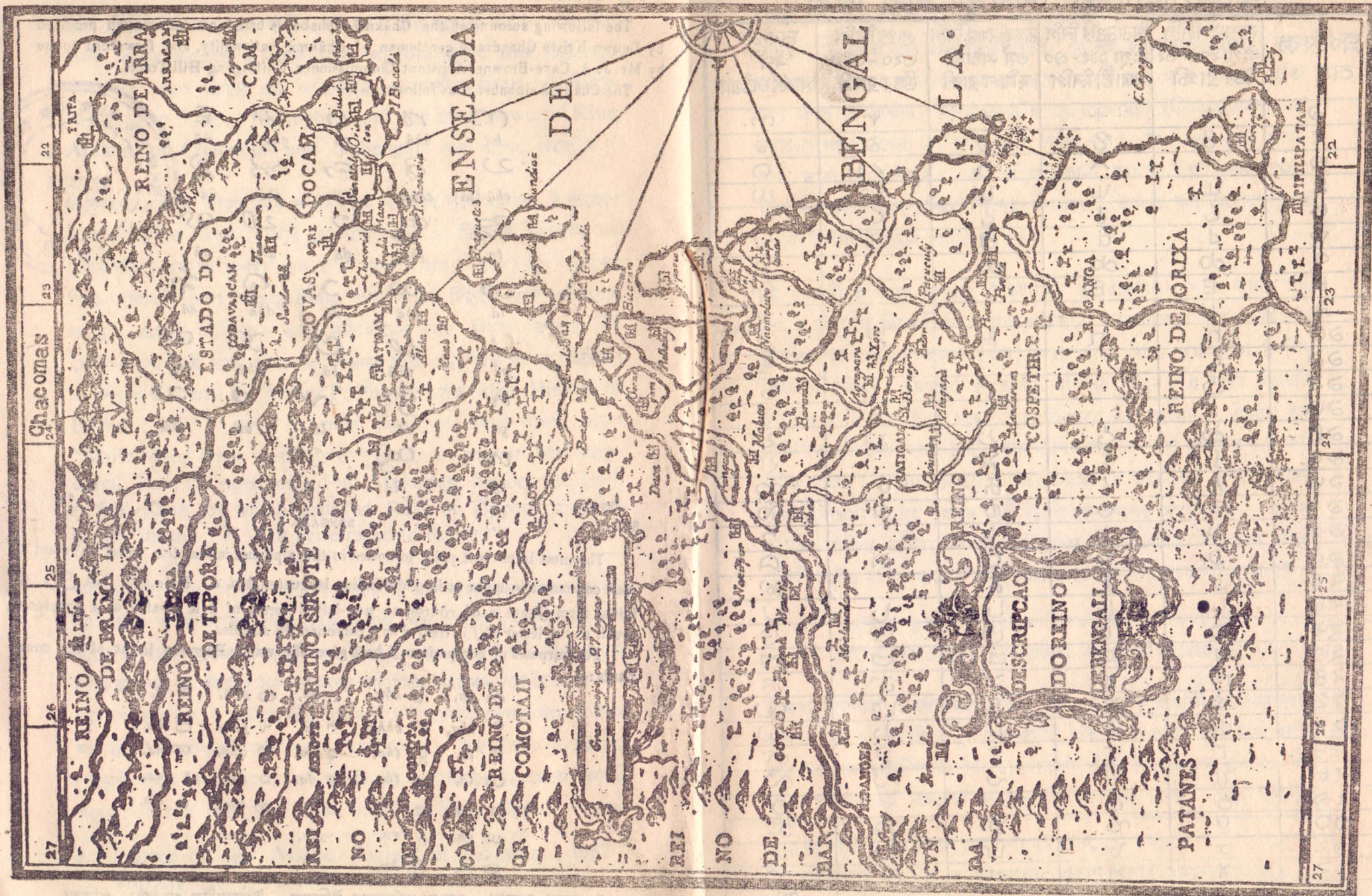
322

BENGALI.

The most important point to notice in this alphabet is that the vowel inherent in each consonant is, not *a* as in other Indian languages, but *ā*. Note also that ṁ the initial form (there is, of course, no non-initial form) of *ā* is treated as a consonant, much as the letter *alif* is treated as a consonant in Arabic.

For purposes of comparison, I here give the usual Burmese forms of the consonants:—

ṁ	ka,	ṁ	khā,	ṁ	ga,	ṁ	ghā,	ṁ	ñ,
ṁ	cha,	ṁ	chhā,	ṁ	ja,	ṁ	jhā,	ṁ	ñā,
ṁ	ta,	ṁ	thā,	ṁ	dā,	ṁ	dhā,	ṁ	nā,
ṁ	ta,	ṁ	thā,	ṁ	dā,	ṁ	dā,	ṁ	nā,
ṁ	pa,	ṁ	phā,	ṁ	ba,	ṁ	bhā,	ṁ	mā,
ṁ	ya,	ṁ	rā,	ṁ	lā,	ṁ	ṁ		
ṁ	na,	ṁ	hā						



১৬০০ খৃষ্টাব্দের কয়েক বছর পূর্বে আরাকানের অধীনস্থ রামু ও চকরিয়ার শাসন-কর্তা আদমশাহ তাঁর প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ত্রিপুরায় পালিয়ে যান এবং ত্রিপুরার তৎকালীন রাজা অমরমাণিক্যের (১৫৭৭-৮১ খৃঃ) আশ্রয় লাভ করেন। এরফলে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাতে ত্রিপুরা চরম এবং চূড়ান্ত ভাবে আরাকানের কাছে পরাজিত হয়েছিল। এরপর আরাকান দুর্বীর গতিতে অর্ধ শতাব্দী ধরে তার আশেপাশের অঞ্চলসহ সুদূর বঙ্গ পর্যন্ত জলে স্থলে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে ইতিহাস সবারই জানা। কাজেই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চাকমা রাজ্যের উপর আরাকানের কর্তৃত্ব বলবৎ ছিল বলে মনে হয়। তবে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার মোগল সুবেদার শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজর্গ উম্মেদ খাঁর সাথে চট্টগ্রামের যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজয়ের পর আরাকানের কর্তৃত্ব তার আশে পাশের অঞ্চলগুলিতে স্বভাবতই হ্রাস পেয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরাকানে তীব্র রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। আরাকানের সিংহাসন নিয়ে রাজপুত্রদের মধ্যে সব সময় কলহ লেগে থাকে। এই সুযোগে সেখানে শাহ সুজার ফেলে যাওয়া মুসলিম কামানচিরা প্রথমে বিদ্রোহ করে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্র পরিবারের বিভিন্ন বিরোধে অংশ নিতে থাকে। তখন আরাকানে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কামানচিরা রাজ প্রাসাদ আক্রমণ করে রাজা, রাণীসহ রাজ পরিবারের অনেককেই হত্যা করে রাজকোষ লুণ্ঠন করে। এরপর পরবর্তী ২০ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তারা তাদের ইচ্ছামত ১০ জন রাজাকে আরাকানের সিংহাসনে বসায়। অতএব ঐ সময় আরাকান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং স্বভাবতই তার আশে পাশের অঞ্চলের উপর আরাকানের কর্তৃত্ব সম্ভবতঃ ছিলনা বলে মনে হয়।

এরপর ১৭১১ খৃষ্টাব্দে চান্দা উজিয়া নামে একজন পরাক্রান্তশালী ব্যক্তি আরাকানের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করলে কামানচিরা তার সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। তিনি তাদের একটি দলকে আরাকান থেকে চট্টগ্রামের দিক বিতাড়িত করেন। তাঁর সময় আরাকানে কামানচিদের প্রভাব চিরতরে খর্ব হয়। চান্দা উজিয়া একজন উপযুক্ত এবং শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি ১৭১১ খৃঃ থেকে ১৭৩১ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এ সময় অষ্টাদশ শতাব্দী রশুর্কতে চাকমাদের রাজার নাম ছিল চন্দন খান। তাঁর সাথে আরাকান রাজা চান্দা উজিয়ার সখ্যতা ছিল বলে জানা যায়। রাজা চন্দন খান পাগলা রাজা সান্তুয়া বড়ুয়ার **বংশধর** ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাদের মধ্যে রাজা জল্লীল খান ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মোগলদের সাথে বাণিজ্য করার জন্য এক চুক্তি করেন। তবে সে চুক্তি রক্ষিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে মোগলদের সাথে তাঁর বিরোধ বাধে। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরাকানে পালিয়ে যান এবং সেখানে পরলোক গমন করেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে রাজ পরিবারের লোকেরা শেরমুস্ত খানের নেতৃত্বে পুনরায় চাকমা রাজ্যে চলে আসেন। শেরমুস্ত খান মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে ছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর রাজ্যের সীমা নিম্নরূপ ছিল—

উঃ ফেনী নদী

দঃ শঙ্খনদীর মধ্যস্থান

পূঃ কুকীরাজ্য (লুসাই হিল)

পঃ নিজামপুর রাস্তা (ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড)°

রাজা শেরমুস্ত খান ১৭৩৭ খৃঃ থেকে ১৭৫৮ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এ সময় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে বাংলার নবাব সিরাজউদৌল্লাহর পরাজয় হলে ইংরেজেরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপর দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রামের শাসন ভার অর্জন করে, “The sunnud confirmatory of the grant, under the seal of Meer Cossim Ally Cawn, sets forth that the thana of Islamabad or Chittagong is granted to the English Company in part disbursement of their expenses and the

৫. ক. বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (১৯৬৯ ইং) পৃঃ ১৫৪

খ. Chittagong Collector's letter to Kalindi Rani on 2nd January 1866. এ সময় Mr. A. Smith চট্টগ্রামের Collector ছিলেন।

monthly maintenance of five hundred European foot, and eight thousand sepoy, which are to be entertained for the protection of the royal dominions.

(2) Mr Harry Verelst afterwards Governor of Bengal, was the first chief of Chittagong. He took formal charge from the nabab Mohammed Reza Cawn at Islamabad on the 5th January 1761".^৬

বাংলায় যখন মোগলদের অবস্থা কাহিল এবং চট্টগ্রাম যখন নবাবের হাতছাড়া হলো তখন এই সুযোগে চাকমা রাজারা পুনরায় স্বাধীন হলেন। তাঁরা ইসলামাবাদের ইংরাজ সরকারকে খাজানা দেওয়া বন্ধ করলেন। তাঁরা ঐ সময় শুধু স্বাধীনই হলেন না চট্টগ্রামের অগ্রান্ত অঞ্চলের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তারেও সচেষ্ট হলেন। চাকমা রাজা জানবক্স খান ও তাঁর সেনাপতি রণুখান সম্পর্কে ব্রিটিশদের রেকর্ডপত্র থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরা হলো—

I.... the old records are full of Jan Bux and Runno Khan. Though Jan Bux was recorded as a zemindar, he maintained his independance for many years, and was only reduced by a battalion of sepoy commanded by British officers, who pursued him to his fastness, and though they could not capture him, brought him to submission This was in 1785.^৭

2. In 1784, one Jan Bakhsh greatly disturbed the peace of the border, and the Collector submitted an elaborate 'plan

৬. H. J. S. Cotton, Memorandum on the Revenue history of Chittagong (1880) pp. 4-5.

৭. H. J. S. Cotton, do p 189.

for excluding him from all communication with the low country.’^৮

3 HOOKUMNAMA

To the Chawdries, Talookdars, Royetts, Farmers, and others dependants on the Sircar Islamabad,—By the complaint of the Sircar Islamabad aforesaid it is know that Dooleb Seree Canoo and Loothang Shigdar & ca. on the part of Jaun Buck Cawn and Runnoo Cawn, do great oppression to the Talookdars and Royetts belonging to them, that they extorted Nuzzers and Seedahs from them, take away their Royetts to erect the Houses of their Khamaurs, send Pulwauns who also extort from the Royetts one Rupee per day, punish them according to their Will, demand Paddy for their use with threats if they are not supplied, they will take by force; prevent pasturing the Cattle upon the Hills, cutting Bamboos, Firewood Straw. Rattan & ca and if any is permitted a fine is exacted for the same, also erect Neeshans on the Jummaabundy Lands and prevent the Royetts to bring the same into cultivation and insist on giving Cobluahs and taking Pottaahs from them, also wound and kill Royetts and Plunder them of their Effects and Property, and Carry away their Cattles into their own Kheels.

৮. Hunter, Statistical Account of Bengal (Chittagong)
p. 177.

That Jaun Bucks and Runnoo Cawn also send their own Palwauns and other People and Carry away the Royetts by force and punish and fine them according to their own will. This is therefore to give notice that you are to apprehend all persons belonging to Runnoo Cawn and Jan Bucks Committing oppressions and preventing them cutting Bamboes, Rottans, Firewood, Straw & ca and bring them to the Huzzoor—Any person acting contrary to these orders they will be surely punished.*

চাকমা রাজা জানবঙ্গ খানের সাথে ইংরেজদের বিরোধ অনেক দিন ধরে চলেছিল। এই বিরোধ ১৭৭৭ খৃঃ থেকে শুরু হয় এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। রাজা জানবঙ্গ খান কলিকাতায় গিয়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। ইংরেজদের সাথে রাজার এই বিরোধের সময় চাকমাদের দুঃখ কষ্টের অন্ত ছিলনা। প্রায় চার হাজার চাকমা এই সময় (১৭৮৪ খৃঃ) ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে যায় এবং তথায় স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে। এই সময় আরাকানের দিক থেকে তঞ্চঙ্গ্যাদের একটি দল পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল। কিন্তু এই গোলযোগের জগ্ন সন্তবতঃ তারা আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যায়। উল্লেখ্য এই সময় চাকমারা টেকনাফ-সহ উহার নিকটস্থ আরাকানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও বাস করতো। চাকমাদের আদিকবি শিবচরণ সন্তবতঃ এই সময়ে “গোবোন লামা” রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনায় নিম্নলিখিত পদটিতে চাকমাদের উক্ত সময়ের অসীম দুঃখ কষ্টের কথা বর্ণিত হয়েছে,

এগার শ চুরাঝি সন

ফলনাবারে সাধুগর এগামন।

.....

হারন্দি রাজার দেচ লাগ ন পেতুং

অঘাদে অপধে যে ন পেতুং ॥

৯. Sirajul Islam Bangladesh District Records, Chittagong, Vol. I PRESS, UNIVERSITY OF DACCA pp 84-85.

অনুবাদ : এগার শ চুরাশি সন

অমুকবারে সাধছি একাগ্রমন।

.....

পরাজিত রাজ্যের সাথে যেন আর দেখা না হয়

অঘাটে অপথে যেন যেতে না হয় ॥

এই সময় চাকমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আরাকানেও মহা রাজনৈতিক দুর্ধোগ উপস্থিত হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বার্মারাজ বোদফয়া ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান দখল করলে মারমা, ম্রো, ব্রুং (ব্রুং-ত্রিপুরা) প্রভৃতি উপজাতীয়রা আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসে। এ সম্পর্কে ২৪শে জুন ১৭৮৭ ইং তারিখে বার্মা রাজার পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের কমিশনারকে লেখা একটি চিঠি থেকে নিম্নলিখিত তথ্যটি জানা যায়, “Domcan Chukma, Kiecopa Lies, Marring and other inhabitants of Arracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border ...”

টেকনাফস্থ জনৈক চাকমা সর্দারকে ধরে দেওয়ার জন্য চট্টগ্রামের কমিশনারের কাছে আরাকান থেকে একটি চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য কংলাপ্র নামে আরাকানের একজন সামন্ত ঐ সময় কিছু সংখ্যক মারমা উপজাতীয় লোক নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবানে পালিয়ে আসেন। তাঁর পুত্র সেতুংপ্র (মতাস্তরে সাকতুং প্র) ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদেরকে প্রথম খাজানা দেন। কংলাপ্রের জনৈক পূর্ব পুরুষ অতীতে আরাকান রাজ দরবার থেকে “বোমাংগ্রী” উপাধি পেয়েছিলেন, ঐ উপাধি থেকে পরবর্তীকালে ঐ এলাকার নাম বোমাং সার্কেল হয়েছিল। ঐখান থেকে মারমাদের আর একটি দল (বিশেষতঃ পলৈংসা জনগোষ্ঠি) পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মংসার্কোলে চলে যায়।

রাজা জানবঙ্গ খান ১৭৮২ খৃঃ থেকে রাজত্ব শুরু করেন এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। আজীবন স্বাধীনচেতা এই রাজাকে ইংরেজরা যুদ্ধ করে হার মানাতে পারেনি। তিনি স্বেচ্ছায় প্রজাদের দুঃখ দেখে ইংরেজদের

কাছে বৈশ্যতা স্বীকার না করলে আজ হয়তো তার ইতিহাস অগুরুত্ব ভাবে লিখতে হতো। ইংরেজদের কাছে তাঁর বশ্যতা স্বীকারকরণ সম্পর্কে চাকমা সমাজে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; তা'হলো ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধকালীন সময়ে একজন গৃহহারা গর্ভবতী স্ত্রীলোক তার অসীম দুঃখ কষ্টের জ্ঞাত রাজাকে দায়ী করে যখন আক্ষেপ করেছিলেন তখন ঘটনাক্রমে রাজা ছদ্মবেশে ঐ কথা স্বকর্ণে শুনে ফেলেন। এতে তিনি খুবই মর্মান্বিত হন এবং প্রজাদেরকে আর ইংরেজদের হাতে কষ্ট না দিয়ে তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে চাকমা রাজাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজ ধরম বক্স খান (১৮১২-৩২ খৃঃ) পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জ্ঞাত প্রস্তুতি নিতে চেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তবে তাঁর সে প্রস্তুতি শেষ পর্যন্ত আর যুদ্ধে পরিণত হয়নি। মহারাজ ধরম বক্স খানের রাজত্বকালে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে চাকমাদের অন্ততম শাখা তঞ্চঙ্গ্যাদের (টিংটিংগ্যাদের) ধন্য-গজা ও লাপোস্তা গম্বার লোকদের মধ্যে তীব্র বিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। তখন উভয় পক্ষ বিচারের জ্ঞাত রাজার কাছে গেলে রাজার বিচারে ধন্য গম্বার লোকদের জয় হয়। এতে লাপোস্তা-গম্বার লোকেরা মনকুন্ন হয়ে চাকমা রাজ্য ছেড়ে আরাকানে চলে যায়। আর তাদের সাথে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আরও ছয়টি তঞ্চঙ্গ্যা গম্বা (দল) চলে যায়।

ঐ চলে যাওয়া দলটির নেতৃত্ব ফা-ফ্রু নামক জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দিয়েছিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজ জেলা প্রশাসক Captain T. H. Lewin নিম্নলিখিত তথ্যটি পরিবেশন করেছেন, The Toungjynya section of the tribe, to the number of 4000 souls, is said to have come into the Chittagong Hills, as late as 1819, in the time of the Chief Dhurmbux Khan would not recognize him as head of the Toungjynya clan, and consequently the major part of them returned to Arracan

উক্ত ঘটনাটি ছাড়া মহারাজা ধরম বক্স খানের আমলে আরও একটি ঘটনা

গুরুত্বপূর্ণ। তা'হলো চাকমা রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাঙ্গুণীয়া থেকে মুসলিম বাঙ্গালীদের একটি দল চাষাবাদের কাজে নিযুক্ত করার জন্য রাঙ্গামাটিতে নিয়ে আসেন। ঐ সময় এখানে ধর্মখিল নামক স্থানটি আবাদ করা হয়েছিল। মহারাজা ধরম বক্স খান হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ইতিপূর্বে রাজা জ্ঞানবক্স খানের পুত্র রাজা জব্বর খানের আমলেই (১৮০১-১৮১২ খৃঃ) সম্ভবতঃ প্রথম বারের মত চাকমা রাজারা হিন্দু ধর্মের প্রভাবে পড়তে শুরু করেন এবং সেই প্রভাব ধরম বক্স খানের মৃত্যুর পরেও রাণী কালিন্দীর রাজত্বের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত গড়ায়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধরম বক্স খানের মৃত্যুর পর রাণী কালিন্দী প্রজাদের শাসন স্বহস্তে তুলে নেন। এতে ইংরেজ শাসকেরা বেকায়দায় পড়ে যান। তাঁরা চাকমা রাজ্যের সরবরাহকার পদে রাজার স্বংগীয় শুকলাল খাঁকে নিযুক্ত করেন। এতে চাকমা রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। ঐ সময় মিজোরাম থেকে দুর্ধর্ষ লুসাইরা পার্বত্য চট্টগ্রামে হানা দেয়। তাদের একটি আক্রমণে শুকলাল খাঁ স্বগৃহে নিহত হন। লুসাইরা তাঁর সুন্দরী কন্যা বডাচোগীকে মিজোরামে ধরে নিয়ে যায়। পরে অবশ্য বডাচোগী একটি ভেলায় চড়ে কর্ণফুলী নদীপথে মিজোরাম থেকে রাঙ্গামাটিতে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাঁর সে পালিয়ে আসার কাহিনী নাটকীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ। শুকলাল খাঁর এভাবে নিহত হওয়ার ঘটনার পিছনে অনেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল বলে মনে করেন।

রাণী কালিন্দীকে ব্রিটিশ সরকার ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সরকারীভাবে স্বীকার করে নেয়। চাকমাদের ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল যথেষ্ট দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল, কোন রাজা বা রাণী তাঁর মত সুদীর্ঘ ২৭/২৮ বৎসর রাজ্য শাসনের সুযোগ পাননি।

রাজত্ব প্রাপ্তির প্রথম অবস্থাতে প্রজাদের উপর রাণীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্ভবতঃ খুব একটা দৃঢ় ছিল না। তাঁর পূর্বে শুকলাল খাঁ যখন স্বল্পকালের জন্য প্রজা শাসন করছিলেন তখন দেওয়ানেরা সুযোগ বুঝে চারিদিকে প্রবল হয়ে উঠেন। তাঁরা স্ব স্ব এলাকায় ছোটো খাটো রাজার মতো চলতে লাগলেন। অনেকের

সাথে আবার মিজোরামের দুর্ধর্ষ লুসাই সর্দারদের বন্ধুত্ব থাকায় তাঁরা পার-স্পরিক বিরোধের সময় একে অপরের বিরুদ্ধে ভাড়া করা লুসাই 'হামলাকারী' প্রেরণ করতে লাগলেন। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর রক্ত ঝরতে লাগলো। কোন একটি আক্রমণে লুসাইরা একদিনে বাইশ মৌজার লোক কেটেছিল বলে অত্যাধি জনশ্রুতি আছে। চাকমা সমাজে আজও “কুগি-ডর” (কুকী-ডর) শব্দটি সেদিনের নৃশংস ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনৈক পুলিশ সুপারের রেকর্ড থেকে জানা যায় ১৮৩৭খৃঃ থেকে ১৮৫৪ খৃঃ পর্যন্ত ১৭টি বৎসরে ঐ সমস্ত দুর্ধর্ষ লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ১৯ বার হামলা চালিয়ে ১০৭জন লোককে হত্যা করে, ১৫জনকে আহত করে আর ১৮৬জনকে মিজোরামে ধরে নিয়ে যায়। চাকমা চারণকবি গেংগুলীরা আজও “কুগিকাবা” বা “চরামিত্তু” পালাগানে সেই বিষাদময় দিনের কাহিনী ব্যক্ত করে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির কারণে ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব দিকের পার্বত্য এলাকাকে নিয়ে Chittagong Hill Tracts District (পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা) নামে নূতন একটি জেলা গঠন করেন এবং বছর কয়েক পরে Captain Tom Herbert Lewin নামে একজন তরুণ ইংরেজকে Superintendant পদে নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। এই তরুণ ভদ্রলোক দিন কিছুর মধ্যে উপজাতীয় রাজাদের প্রশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে গোলমাল পাকাতে লাগলেন। তিনি বান্দরবানের তৎকালীন বোমাং রাজাকে বদলিয়ে রাজ পরিবারের আর একজন সদস্যকে রাজা করলেন। আর রাণীর সাথেও তিনি বিরোধে মেতে উঠলেন।

২রা জানুয়ারী ১৮৬৬ ইং তারিখে চট্টগ্রামের Collector, Mr. A. Smith রাণীকে তাঁর রাজ্যের সীমা সম্পর্কে নিশ্চিত করার জন্য যে চিঠিটি লিখে ছিলেন নিয়ে তা' প্রদত্ত হলো,

“Mr Harry Verelst, Chief of the Chittagong Council of the period, declares that it had been proved to his satisfaction

that all the hills from the Fanny to the Sungoo and from the Nizampore road (apparently a road following the course of the present Dacca road) to the hills of the Kukee Rajah pertained to zamindary of Rajah Sher Must Khan in the Kapas Mahal department and directed that he should continue in possession thereof paying the revenues of Government and prohibited the Subordinate Officers from interfering with him, his heirs and successors in this holding.”

কালেক্টরের এই আশ্বাস পরবর্তীকালে (Lewin) রাখলেন না। তিনি রাণীর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশের বর্তমান “মঙ-সার্কেল” এলাকাটি রাণীর রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে ক্যাজ চাই নামক জনৈক মগ সর্দারকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Chief বানিয়ে দিলেন। অথচ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে চট্টগ্রামের তদানীন্তন কালেক্টর James Irwinকে গভর্ণমেন্ট যে পত্র দেয় তাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি ছিল,

“..... in 1829 Mr. Halhed the Commissioner stated that the hill tribes were not British subject, but merely Tributories and that we recognised no right on our part to interfere with their internal arrangement.”^{১০} লুইন ঐ সমস্ত বাক্যের ধারে কাছে না গিয়ে রাণীকে তাঁর আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে অর্থাৎ উপজাতীয়দের সামাজিক বিচারে হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করলেন। এতে তাঁর উদ্বেগ কতপক্ষে তাঁকে উপজাতীয়দের সমাজ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য কড়া ভাষায় উপদেশ দিলে লুইনের সে চেষ্টা খুব বেশী ফলবতী হয়নি। তবে সুযোগ পেলেই তিনি রাণীর ক্ষতি করতে লাগলেন। তাঁর সাথে বিরোধের ফলে রাণীর ব্যক্তিত্ব আরও বেড়ে যায়। চারিদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে লুসাইরা আসামের কাছাড়, সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, পার্বত্য

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের উপর ব্যাপক হামলা, লুণ্ঠরাজ্য, খুনখারাপি, কিড-
ন্যাপিং ইত্যাদি শুরু করলে ব্রিটিশ সরকার ছ'জন জেনারেলের নেতৃত্বে কাছাড় ও
পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে মিজোরামে ছ'দল সৈন্য প্রেরণ করেন। উক্ত
অভিযানে প্রায় ৪০০০ সৈন্য অংশ গ্রহণ করেছিল।

ঐ অভিযানে লুসাইরা অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়। ঐ অভি-
যানে ক্যাপ্টেন লুইনও অংশ নেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসক পদে
কাজ করার সময় লুইন তাদের এলাকায় গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত নানা গুণের
জ্ঞান লুইন তাদের কাছে অতিমানব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরাজিত
লুসাইরা ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণের সময় তাদের প্রধান রাজা সাংবুঙ্গা
এবং তাঁর ভ্রাতা বেংকুইয়া ইংরেজ জেনারেলদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে
লুইনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এর ফলে লুইনের কপালে খারাপ
পুরস্কার জুটলো অসময়ে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে পঞ্চচুল নিয়ে ভয়হুদয়ে লুইনকে
স্বদেশে ফিরে যেতে হয়।

রাণীর সাথে বিরোধের জ্ঞান চাকমারা লুইনকে আজও স্মরণ করে থাকে। রাণীকে
ক্ষতি করতে গিয়ে লুইন চাকমাদের অনেক ক্ষতি করেছেন। নিজেকে একজন
বীর হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জ্ঞান তিনি ষতটুকু উদগ্রীব ছিলেন কার্যতঃ প্রশাসক
হিসেবে তিনি ততটুকু যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। তবুও চাকমা এবং
লুসাইরা লুইনকে চিরদিন মনে রাখবে কারণ তিনি এখানকার অনেক ইতি-
হাসের সাক্ষী ছিলেন। আরও একটি কারণে লুইন এখানে স্মরণযোগ্য, তিনিই
প্রথম এই অঞ্চলের উপজাতীয় লোকদের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা ও
সাহিত্যের উপর নিম্নলিখিত বইগুলি লেখেন,

১। The Hill tracts of Chittagong and the dwellers therein
(1869)

২। A Fly on the wheel.

৩। The Wild Races of South Eastern India.

চাকমা রাজ্যে দীর্ঘদিন যাবত দেওয়ানেরা রাজার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করছিলেন। রাণী তাঁর শাসনামলে প্রজাদেরকে কয়েকটি মনুষ্য-তালুকে বিভক্ত করে তালুকদার প্রথার সৃষ্টি করেন। এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তদ-স্থলে হেডম্যান (Headman) প্রথা চালু করেন। এক মৌজায় একজন হেডম্যান থাকেন। হেডম্যানরা মৌজাবাসীদের কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে রাজার মনোনয়ন লাভ করেন। তাঁদের সাহায্যের জন্ত প্রতি গ্রামে একজন কার্বারী (মোড়ল) থাকেন। তিনিও গ্রামবাসীদের কর্তৃক মনোনীত হয়ে হেডম্যানের কাছ থেকে মনোনয়ন অর্জন করেন। এভাবে হেডম্যান-প্রথা চালুর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার উপজাতীয় সামাজিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে খুব ধীরে উপজাতীয়দের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঢুকে পড়লেন। সেই সাথে ১লা জানুয়ারী ১৮৬৯ ইং তারিখে চন্দ্রঘোনা থেকে জেলার সদর দপ্তর রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়।

রাণী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর রাজহি তঁার সতীন হারিবীর কন্যা চিকনবীর (মেনকার) সন্তান হরিশ্চন্দ্রকে দিয়ে যান। হরিশ্চন্দ্র রাজা জ্ঞানবক্স খানের বিখ্যাত সেনাপতি রণুখানের প্রপৌত্র গোপীনাথ দেওয়ানের সন্তান। হরিশ্চন্দ্র পরবর্তীকালে রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন।

রাণী তাঁর প্রশাসন পরিচালনায় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিলেও একজন যোগ্য রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারেননি। লুইনের সাথে তাঁর বিরোধের ফলে কেবল মও সার্কেলটি তাঁর হাতছাড়া হয়নি, ২৫০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে চাকমা অধ্যুষিত বর্তমান “চাকমা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল” এলাকাটিও মিজোরামের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমা নির্ধারণের সময় তা’ মিজোরামের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়; এতে ঐ এলাকাটিও চাকমা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তবে লুসাই, পাংখোয়া, বোম, প্রভৃতি কুকি-চীন ভাষাভাষী উপজাতীয় লোক-দের সর্দারদের উপর রাণীর যথেষ্ট প্রভাব ও বন্ধুত্ব ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বোম উপজাতীয় লোকেরা লিয়ানকুং নামক জৈনিক সর্দারের

নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসেন, তখন লিয়ানকুং রাণীর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।^{১১}

বোমদের এ জেলায় আগমন সম্পর্কে ব্রিটিশদের লেখা থেকে নিম্নলিখিত তথ্যটি পাওয়া যায়, “From the traditions collected by Spielman (1966) we know today that 1830-1840 were the years when the Bawm-Zo (the Bunjogi of the former reports) consolidated themselves under their leader Liankung, entered the Chittagong Hill Tracts, submitted to Sa Taing Phru and finally settled in the Noapatong area (Mauza No. 345). Liankung himself was a Shindu who, before entering the Hill Tracts, had attacked and looted a Khumi village in Arakan (Phayre 1841 : 708)^{১২}

রাণীর শাসনামলে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, তাঁর আমন্ত্রণে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের চাকমা রাজ্যে আগমন এবং রাজানগরে মহামুনি মন্দির প্রতিষ্ঠা। রাণী সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরকে চাকমা বর্ণে লিখিত একটি পদক দেন এবং তাঁকে ধর্ম প্রচারে সর্ব প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেন। ঐ সময় রাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় নীল চন্দ্র দাস ও ফুলচন্দ্র লোথক কর্তৃক বর্মী ভাষায় লিখিত থাঙ্গুওয়াং গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করা হয়। যা বৌদ্ধ রঞ্জিকা নামে রাণীর মৃত্যুর (১৮৭৩ইং) বেশ কয়েক বৎসর পরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরকে ধর্ম প্রচারে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের জন্য রাণী চিরদিন চাকমা ও বড়ুয়া সমাজে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১১. লাল নাগ বোম, উপজাতি পরিচিতি : বোম, অন্ধুর (১৯৮১ইং) ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৪

১২. Lorenz G. loffler, A note on the history of the Marma Chiefs of Bandarban of the Asiatic Society of Pakistan (1968), Vol. XIII, No. 2. p. 195.

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে রাজা হরিশ্চন্দ্র নূতন সমস্তার সম্মুখীন হলেন। হঠাৎ করে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা সার্কেল, মঙ সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও খাসমহল, মোট চারটি সার্কেলে বিভক্ত করেন। আর ঐ বৎসর থেকে কক্সবাজারের খাজানা পার্বত্য চট্টগ্রামের মাধ্যমে সংগ্রহ না করে সরাসরি চট্টগ্রামের মাধ্যমে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেন। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে কক্সবাজারের উপজাতীয় লোকদের যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐ সময় নাবালক থাকায় তাঁকে রাজকার্বে সহযোগিতা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার একজন সরকারী কর্মচারীসহ ৪জন দেওয়ান নিয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠন করেন। এতে প্রত্যেক সদস্যকে মাসিক ৫০'০০ বেতন দেওয়া হয়। এই কাউন্সিল ২৩।১১।১৮৮৪ইং থেকে ২২।১।১৮৮৫ইং পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

উল্লিখিত সার্কেল সৃষ্টির পর পুনরায় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লোক গণনার সময় চাকমা সার্কেলকে ৯টি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক খণ্ডে বেশ কয়েকটি মৌজা পড়ে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক খণ্ডকে “তালুক” নামে অভিহিত করা হয় এবং তাতে একজন করে ‘তালুক-দেওয়ান’ নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। উক্ত তালুক-দেওয়ানেরা বিপুল ক্ষমতা অর্জন করেন। তারা স্ব স্ব তালুকের হেড-ম্যানদের বিচারের পুনঃ বিচার করতে পারতেন, দোষীকে ১০০'০০ পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল, যা হেডম্যানরা পারতেন না। তা'ছাড়া বিচারের সময় আসামীকে হাজতবাস পর্যন্ত দিতে পারতেন। তালুক-দেওয়ান দের এহেন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে চাকমা সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ রাজ-ক্ষমতায় দুর্বলতা দেখা দেয়। যা পরবর্তীকালে সামাজিক অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আসাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলাকাকে ভারতের অস্থায়ী অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথকভাবে শাসন করার জন্য Excluded Area ঘোষণা করেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামে

Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 নামে নতুন একটি Act চালু করেন ; যা আমাদের কাছে **Hill Tracts Mauual** নামে পরিচিত । এরফলে এই অঞ্চলের উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংসের হাত থেকে এতকাল রেহাই পায় ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য শাসনে অনুপোষিততার পরিচয় দিলেও তাঁর ছেলে রাজা ভুবন মোহন রায় (১৮৯৭-১৯৩৩ খৃঃ) চাকমা ইতিহাসে একজন গৌরবজনক ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন । তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয়কে “চাকমা জাতি” নামক একটি গ্রন্থ লিখতে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন । ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা নিজেও “চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস” এবং **History of the Chakma Raj Family** নামে দু’টি গ্রন্থ লেখেন । তাঁর রাজত্বকালে চাকমাদের মধ্যে যামিনী রঞ্জন দেওয়ান সর্বপ্রথম ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে, রাজেন্দ্র তালুকদার ১৯২০ (২) খৃষ্টাব্দে এবং কৃষ্ণ কিশোর চাকমা ১৯২১ (?) খৃষ্টাব্দে B.A. পাশ করেন । কৃষ্ণ কিশোর চাকমা সাধারণ চাকমাদের শিক্ষার ব্যাপারে পরবর্তীকালে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন । তিনি ১৯২২ খৃঃ থেকে ১৯৩৫ খৃঃ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ পদে নিযুক্ত ছিলেন ।

ঐ সময় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (?) কামিনী মোহন দেওয়ান জনসমিতি নামে প্রথম বারের মত পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেন ।^{১৩}

রাজা ভুবনমোহন তৎপুত্র কুমার নলিনাক্ষ রায়ের জন্ম ভারতের বিখ্যাত বাগ্মী কেশব চন্দ্র সেনের নাতনী বিনীতা রায়কে পুত্রবধূ রূপে গৃহে আনেন । পরবর্তীকালে রাণী বিনীতা রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যমাটি থেকে “গৈরিকা” নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্র ১৯৩৬ খৃঃ থেকে ১৯৫১ খৃঃ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় । গৈরিকা তাঁর জন্মলগ্নে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভে সক্ষম হয়েছিল ।

১৩. কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী (১৯৭০ইং)

ঐ সময় চাকমাদের চিত্রশিল্পী চুনিলাল দেওয়ান চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি ১৯২৫ খৃঃ থেকে কবিতা লেখতেও শুরু করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর রচিত গৈরিকায় প্রকাশিত “ঘর ছয়ারত এইনে কন্না সিবা ডাগে মরে” গানটি আজ অনেকেরই জানা।

সাহিত্য কর্মে রাজা ভুবন মোহন রায়ের ব্যক্তিগত অনুরাগের জ্ঞাত ঐ সময় ধর্মধন পণ্ডিত তাঁর “চান্দবী বারমাচ” নামক কাব্যটি রচনা করেন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ফিরিঙচান ওরফে প্রবোধ চন্দ্র চাকমা “আলঝি কবিতা” নামক পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। এ যাবতকাল পর্যন্ত বাংলা বর্ণে চাকমা সাহিত্য রচনায় ঐটিই ‘সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা’।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মিলার নামে জ্ঞানৈক ইংরেজ ঐ স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব স্কুল পদে নিযুক্ত থাকার সময় CHAKMA PRIMER নামে বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় সর্বপ্রথম একটি শিশু পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন এবং তা’ বিভিন্ন স্কুলে পড়ানোর জ্ঞাত চেষ্টা চালান। কিন্তু কামিনী মোহন দেওয়ান তাঁর দলবল নিয়ে উঠে পড়ে উক্ত পুস্তকটির পড়ানো বন্ধ করে দেন। তাঁর ধারণা এতে মিলারের কোন বদ উদ্দেশ্য আছে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে খৃষ্টান মিশনারীরা তৎকালে চাকমাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম জনপ্রিয় করার জ্ঞাত নানা প্রচেষ্টা চালাতো। তাদের অনেক প্রচেষ্টার মধ্যে চাকমা ভাষায় বাইবেলের গল্প অনুবাদও একটি বিষয় ছিল। তারা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের কোন প্রেস থেকে চাকমা বর্ণে চাকমা ভাষায় একটি বাইবেলও প্রকাশ করেছিল।

চাকমা ভাষা প্রচারে মিলারের কি উদ্দেশ্য ছিল তা’ জানা যায়নি। তবে কামিনী মোহন দেওয়ানের বাধা দেওয়ার ফলে তা’ আর কার্যকর হয়নি। এদিকে খৃষ্টান মিশনারীরা চাকমাদেরকে বৌদ্ধধর্ম থেকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অনেক চেষ্টার পরও ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে মিজোরামে পাততাড়ি গুটালো। এটাই সম্ভবতঃ ইংরেজদের চাকমাদের কাছে একমাত্র শোচনীয় পরাজয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম একেতো উপজাতীয় দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ প্রধান অঞ্চল হওয়ায় এটি কোন দেশে পড়বে তা' নিয়ে যথেষ্ট সমস্যা ছিল। তবে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা চট্টগ্রাম জেলার সাথে জড়িত থাকায় এবং চট্টগ্রাম বন্দরের আয় এ জেলার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের বক্তব্য হলো,

“.....Burrows had explained to me that the whole economic life of the people of Hill Tracts depends upon East Bengal, that there are only one or two indifferent tracks through the Jungle into Assam, and it would be disastrous for the people themselves to be cut off from East Bengal. The population consists of less than a quarter of million, nearly all tribemen who, if they have any religion at all are Buddhists (and so are technically non-Muslim, under the terms of the Boundary commission). In a sense Chittagong, the only port of East Bengal also depends upon the Hill Tracts ; for if the jungles of the later were subjected to unrestricted felling, I am told that Chittagong port would be silt up.”^{১৪}

পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতার পরবর্তী প্রথম কয়েক বৎসর এই এলাকাবাসীদের উপর খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে এখানে জেলাবাসীদের উন্নয়নেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এতে এই এলাকাটি আরও বেশী সবক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ থেকে যায়।

ইতিমধ্যে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কাম্পাইয়ে বিরাট একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার ফলে কর্ণফুলী, কাসালং, চেন্দী, মাইয়ুনী, রাইখাং প্রভৃতি নদীর

১৪. Larry Collins and Dominique Lappierre, Mountbatten and the partition of India (1982), p. 178.

ছ'তীরের বিস্তার এলাকা জলমগ্ন হয়। প্রায় ২৫০ বর্গমাইলের উপর এলাকা জলে ডুবে যায়। চাষযোগ্য জমির শতকরা ৪০ ভাগ জলমগ্ন হয়। প্রায় ৫৪,০০০ একর আবাদী জমি ডুবে যাওয়ায় হাজার হাজার লোক বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে উপজাতীয়দের মধ্যে সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাকমারা। পাকিস্তান সরকারের পুনর্বাসন ব্যবস্থায় ক্রটি থাকায় হাজার হাজার গৃহহারা চাকমা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে যায়। তারা সেখানে মিজোরাম মিকিরহিল (কাছাড়) এবং অরুণাচলে (নেফায়) আশ্রয় লাভ করে। বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের বাদবাকী যারা এখানে থেকে যায় তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা শোচনীয় রূপ ধারণ করে।

এদিকে দীর্ঘকাল ধরে জুমচাষের ফলে পাহাড়ের উর্বরতা নষ্ট হওয়ায় জমিহারা হালচাষীদের মত জুমচাষীদের অবস্থাও খারাপ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় চাকুরীর প্রয়োজনে চাকমা সমাজ ব্যাপক ভাবে শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে চাকমা সমাজে দ্রুত গতিতে শিক্ষার হার বেড়ে যায়।

পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে যথেষ্ট সংখ্যক স্কুল খুলে দেন এবং চাকুরী ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দান করেন। এতে চাকমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে যথেষ্ট খারাপ হলেও সরকার চাকমাদের বাঁচার জন্য মোটামুটি একটা গতি করে দেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে প্রথমবারের মত একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীকালে এ জেলার অধিবাসীদের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল।

এরপর ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সারা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলন শুরু হলে এ জেলার ছাত্র সমাজ দেশের অগাধ ভাই-বোনদেরকে সমর্থন জানায়। তারা আইয়ুব শাহীর পতনের সমর্থনে রাঙ্গামাটিতে মিছিল বের করে। এমনকি পরবর্তীকালে মুক্তি যুদ্ধেও অনেকে যোগ দেয়।

এরপর ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। নূতন সরকার এ জেলার উন্নয়নে এখানে “পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড” নামে একটি বোর্ড

গঠন করেন। উক্ত বোর্ড থেকে স্কুল, কলেজ ও ইউভার্সিটিতে অধ্যয়নরত উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রতি বছর বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এ অঞ্চলের উপজাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্ত সরকার ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে একটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গঠন করেছেন। এই ইনস্টিটিউটে একটি উপজাতীয় যাত্নঘরও খোলা হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে উপজাতীয় ভাষায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানও প্রচার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকারের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে ছ'টি কলেজ চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া রাঙ্গামাটিস্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (BSCIC) এ অঞ্চলের উপজাতীয় পোষাক পরিচ্ছদের উন্নয়ন ও বিক্রয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আশা করা যায়, সদাশয় সরকার আগামীতে এখানকার উপজাতীয় জনগণকে জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে উন্নতির জন্ত আরও অধিক সুযোগ সুবিধা দান করবেন।

ইতিমধ্যে চাকমা সমাজ নিজেদের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি অর্জন করেছে। এগুলির মধ্যে চাকমা তরুণদের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্যচর্চা, বেইন টেক্সটাইলের উপজাতীয় পোষাক নির্মাণ, উপজাতীয় তরুণ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের “মোনঘর অনাথ আশ্রম” প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৬০ইং পর থেকে চাকমা সমাজে বেশ কয়েকজন গুণী, জ্ঞানী এবং সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় কবি সলিল রায়ের কবিতা ও গান চাকমা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করেছে। অতাবধি তাঁর রচিত “নম বুদ্ধ শরনত” গানটি আমাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে আছে। পণ্ডিত বিপুলেশ্বর দেওয়ান আজ দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে স্বগৃহে শিক্ষকতা করে বহু ছাত্র ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও অগ্ন্যস্ত্র প্রকৌশল কলেজগুলিতে অধ্যয়নের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বেশ কয়েকজন আজ বিদেশে অধ্যয়নরত রয়েছেন। তাঁর মহতী শিক্ষাদান চাকমাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভাস্তে) দীর্ঘ ৮৫ বছর গভীর অরণ্যে ধ্যান সাধনা সমাপনের পর লোকালয়ে ফিরে এসে ধর্মপিপাসুদের কাছে প্রতিদিন

অক্লান্তভাবে ধর্মদেশনা করছেন। তাঁর ডাকে বেশ কয়েক বছর ধরে এখানে বিরাট ভাবে কঠিন চীবর দানোৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। ঐ দানোৎসবে স্বধর্মপ্রাণ চাকমা মহিলারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুলা থেকে চর্কা কেটে সুতা তৈরী করে তা দিয়ে চীবর তৈরী করে সম্মিলিতভাবে দেশ ও জাতির সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে দান করছেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য যা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদেরকে অতীত দিনের ধর্মীয় গোরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চাকমা (চাঙমা) এবং চমুআ :

চাকমারা নিজেদেরকে চাংমা বলে। চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা চাকমাদেরকে চামুআ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরারা চুংমা/চাংমা বলে। শব্দটির বৃৎপত্তি এবং অর্থ কি হতে পারে তা' গবেষণার বিষয়।

চাকমাদের কিংবদন্তীটি অনুসারে রাজা বিজয়গিরি ৭ চমুঃ সৈন্য নিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান জয় করে ছিলেন। এক্ষেত্রে সংস্কৃত চমুঃ থেকে যদি চামুআ বা চাংমা শব্দটি এসে থাকে তবে চাংমা শব্দটিকে সৈনিক বোধক কোন শব্দ মনে করা যেতে পারে। উল্লেখ্য আরাকানে দৈংনাক নামে চাকমাদের একটি অংশ আছে। আর দৈংনাক শব্দের অর্থ আরাকানী ভাষায় ঢালধারী সৈন্য।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে অসামের অহোম উপজাতীয় লোকদের মধ্যেও চমুআ (Chamua) নামে উচ্চ বংশীয় কিছু লোক আছে। আর চাকমাদের সাথে অহোমদের চেহারাগত সাদৃশ্য বাদেও বেশ কিছু বিষয়ে মিল আছে যথা—

(১) ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে দুইটি মাত্র মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির উপজাতি আছে যারা এখানে নিজেদের আদি ভাষাকে ছেড়ে আর্য ভাষাকে গ্রহণ করেছে। তাদের একটি অহোম, যাদের ভাষা অহোমীয়া ভাষার অন্তর্ভুক্ত অগ্নিটি চাকমা যা বাংলা ও অহমীয়ার মত।

(২) চাকমা ও অহোমদের (পুরাতন) বর্ণগুলি একই পরিবারভুক্ত। অহোম বর্ণগুলি সম্পর্কে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক Dr. G. A. Grierson এর বক্তব্য হলো,

“Every consonant has the letter a inherent in it, the same occurs in Chakma spoken in Chittagong Hill Tracts, which is an Aryan language using an alphabet belonging to the same group as that of ahom.”^{১৫}

(৩) চাকমাদের বিবাহে প্রধান পূজা অনুষ্ঠানের নাম চুমুলাও আর অহোমদের বিবাহ অনুষ্ঠানের নাম চাকলাও। এ ছাড়া উভয় জাতীয় লোকদের মধ্যে বিবাহের পর নবদম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ পরীক্ষা করার জন্ত মোরগের ঠ্যাং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো একটি সাধারণ ব্যাপার।

(৪) চাকমাদের মধ্যে বড়ুয়া শব্দটি সেনাপতি বাচক। আর অহোমদের রাজ্যে বড়ুয়া শব্দটি রাজ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য ছুঁজন চাকমা রাজার নাম বুড়া বড়ুয়া ও সান্তুয়া বড়ুয়া ছিল।

(৫) চাকমারা পাহাড়ের ঢালু অংশে গাছ বাঁশ কেটে ঐগুলি পুঁড়িয়ে সে স্থানে যে পদ্ধতিতে চাষ করে তার নাম জুম আর যে দা দিয়ে জুম চাষ করা হয় চাকমা ভাষায় তার নাম তাগল। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম বঙ্গের খ্যাতনামা লেখক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় তাঁর সপ্ত প্রকাশিত “মন জানে” নামক গ্রন্থে ১৬/১৭ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যটি পরিবেশন করেছেন, “চীন দেশের পশ্চিম অংশ হতে এসে যারা আসামে বসবাস করতে থাকে তাদের বলা হত ‘চাওথিয়াস’। এই ‘চাওথিয়াস’ কথাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চারণের পার্থক্য হেতু ‘জিহিথিয়াস’ শব্দে রূপান্তরিত হয়। এই ‘জিহিথিয়াস’ শব্দটির অর্থ উচু প্রদেশের লোকেরা পাহাড়ে একস্থান থেকে অগ্নস্থানে চাষ আবাদ করত।

.....টাকাল বা দামরা দিয়ে গর্ত করে বীজ বুনে যে চাষ করা হয় তাকে ওরা বলত “জাহোমা” এই জাহোমা শব্দটি কালক্রমে “জুম” নামে পরিচিত

হয়েছে। যার অর্থ উঁচু পাহাড়ে ঢালুতে চাষ। যে উপজাতীয়রা এই প্রকার চাষ করে তাদের 'জুমিয়া' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এ স্থলে অহোমদের Chamua দের সম্পর্কে পাঠকদের অবগতির জ্ঞা কিছু তথ্য নিয়ে পরিবেশিত হলো,

1. The Rajkhowas were local Governors with command over 3000 men. The Rajkhowas administered justice in their allotted districts. They were also employed as Superintendents of public works. They were recruited from 'Chamua' Ahoms belonging to Ahom nobility.^{১৬}

2. Generally speaking, revenue was not collected in cash or corn ; nor were the officers paid pay in money. The subjects were divided mainly into Chamuas-high class Ahoms .. Chamuas were exempted from personal service ; they had to owe allegiance to the King and render active military service in times of war ; otherwise they had ample freedom.^{১৭}

3. The one work that was most important for the high class Ahoms, Chamuas, was to go to war for the defence of the country and to show proficiency in warfare, which was followed by royal recognition, rewards from the King and grants of lands or office. This accounted for their keen desire to be efficient warriors, that become evident

16. Dr. Nirmal Kumar Basu, Assam in the Ahom age (1970) p 111

১৭. Dr. Nirmal Kumar Basu, Assam in the Ahom age (1970) p. 117

from childhood and at home they learnt archary swordship, handling of spars etc., from father to son. Home was the training centre.^{১৮}

(৬) থাই, শান এবং অহোমরা মূলতঃ একই জনগোষ্ঠী। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে অহোমরাজ সুকুফার নেতৃত্বে শানদেরই একটি শাখা ভারতের আসাম রাজ্যে আসে যারা পরবর্তীকালে অহোম নামে পরিচিত হয়। অহোমদের মূল জনগোষ্ঠী শানদের সাথে চাকমাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের মিল আছে বলে Dr. Heinz Bechert তাঁর নিম্নলিখিত প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন।

Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura, Educational Miscellany, Vol. IV Nos. 3 & 4 December 1967.

ত্রিপুরার সাথে চাকমাদের সম্পর্ক :

সুদীর্ঘকাল ধরে চাকমাদের সাথে ত্রিপুরার সম্পর্ক রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থ রাজমালায়ও চাকমা, চাখমা, সাম ইত্যাদি শব্দগুলি পাওয়া যায়, যেমন—

“কাইফেঙ্গ চাকমা আর খুলঙ্গ লঙ্গাই।

তনাউ তৈয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাই ॥

থানাংছি প্রতাপসিংহ আছে যত দেশ

লিকা নামে আছে জাতি রাজ্যমাটি শেষ ॥”^{১৯}

শ্রী কালী প্রসন্ন সেন কর্তৃক প্রণীত রাজমালার (১৯৩১-১৯৩৬ইং) ২য় লহর (সংখ্যায়) ‘মানচিত্র নং ৫’ এ চাকমা নামে কোন স্থানের নাম নেই। তবে

১৮ Dr. Nirmal Kumar Basu, Assam in the Ahom age (1970) p 252

১৯. শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন, শ্রী রাজমালা ২য় লহর, পৃ: ৩২

চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে “চাকমা” নামে একটি স্থানের নাম দেখা যায়। এ ছাড়া আধুনা চট্টগ্রাম শহরে “চাকতাই” নামক যে স্থানটি রয়েছে তার নামের ব্যুৎপত্তি কি হতে পারে তা’ চিস্তার বিষয়।

চাকমা ইতিহাসে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে সান্তুয়া বড়ুয়া (ওরফে পাগালা রাজা) নামে একজন রাজার বিধবা স্ত্রী কান্তুয়া রাণী) প্রজা বিদ্রোহের ভয়ে ত্রিপুরায় পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একজন কর্তব্যাক্তিকে বিয়ে করে “পিড়াভাঙ্গা” নামে একটি সন্তানও প্রসব করেছিলেন। চাকমাদের সাতটি গরায় (দলে) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরাদের তিনটি দফায় (দলে) পিড়াভাঙ্গা গোষ্ঠির লোক রয়েছে। চাকমাদের পিড়াভাঙ্গা গোষ্ঠির লোকেরা উল্লিখিত পিড়াভাঙ্গার বংশধর বলে জনশ্রুতি রয়েছে

উল্লেখ্য তৎকালে ত্রিপুরায়ও কখনও কখনও বড়ুয়া শব্দটি সেনানায়ক অর্থে ব্যবহৃত হতো। যেমন অমর মাণিক্য মহারাজ উদয় মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫৬৭-১৫৭২খৃঃ) চট্টগ্রাম থানায় বড়ুয়া পদে নিযুক্ত ছিলেন।

চাকমা রাজা শেরমুস্ত খানের আমলে (১৭৩৭-১৭৫৮খৃঃ) তাঁর পালিত পুত্র যুবরাজ শুকদেব রায়ের সাথে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সখ্যতা ছিল। ত্রিপুরার রাজ পরিবার শুকদেব রায়কে একটি ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মূর্তি উপহার দিয়েছিলেন। ঐটি বর্তমান চন্দ্রঘোনার অনতিদূরে ত্রিপুরা সুন্দরী ছড়ার তীরে একটি পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এখন কালের প্রবাহে সেখানে আর দেবীর মূর্তি এবং মন্দিরটি নেই তবে সেখানে ছড়াটি (নদীটি) আজও ঐ নামে প্রবাহিত হচ্ছে।

ইতিহাসে দেখা যায় ত্রিপুরার দিক থেকেও মাঝে মধ্যে বিভিন্ন বিদ্রোহের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে লোকজন পালিয়ে এসেছে। যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরাদের রিয়াং উপজাতীয় লোকেরা মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময় (১৪৬৩-১৪৬৭খৃঃ) রাজ্য কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মাইয়ুনী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত পালিয়ে এসেছিল। তারা ঐ সময় মাইয়ুনী

টালাং থেকে এখানে পালিয়ে এসেছিল বলেই সম্ভবতঃ নদীর নাম মাইয়ুনী হয়েছে। ত্রিপুরা ও রিয়াং ভাষায় “মাই” অর্থ ধান এবং ভাত ছোটোই বুঝায়। মাইয়ুনী টালাং শব্দের অর্থ সম্ভবতঃ ধাতু এলাকা বা পাহাড়।

এরপর সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য (১৬৫৯-৬৬খৃঃ) ছত্রমাণিক্য কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে এখানে দীঘিনালায় কিছুদিন নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় ত্রিপুরার রাজ পরিবারে বিদ্রোহ দেখা দিলে ত্রিপুরার সেনাপতি পরীক্ষিৎসহ রাজ পরিবারের কয়েকজন লোক পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে মিজোরাম পর্যন্ত পালিয়ে যায়। এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ত্রিপুরার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশের যোগাযোগ দীর্ঘকাল ধরে বজায় ছিল।

ত্রিপুরার ইতিহাসগ্রন্থ রাজমালা পাঠে জানা যায়, ত্রিপুরার দক্ষিণ দিকের সীমা বরাবর আচরঙ্গ (আচলং নদী) পর্যন্ত ছিল। তবে মহারাজ রত্নমাণিক্যের পিতা মহারাজ ধাঙর ফার (ধর্মমাণিক্যের ?) সময় ত্রিপুরার রাজ্যের সীমা দক্ষিণ দিকে কাসারঙ্গ (কাসালং নদী) পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। রত্নমাণিক্য গোড় সৈন্যদের সহায়তায় তাঁর পিতাকে মতান্তরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজাফাকে সিংহাসন থেকে ত্রিপুরার রাজ্য হন। তিনি তাঁর ভাইদের অনেককে হত্যা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে রামগড় মহকুমায় তোইলাইফাং নামে একটি নদী আছে। এখানে রত্নমাণিক্যের ভয়ে পলায়নরত একজন ত্রিপুরা রাজপুত্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে কলাগাছ (লাইফাং) রেঁধে খেয়েছিলেন বলে ঐ নদীর নাম তোই-লাইফাং হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে।

রত্নমাণিক্যের আর একজন ভ্রাতা নাকি কাপ্তাই নদীর তীরে এসে ধরা পড়ার ভয়ে কেঁদেছিলেন তাই ঐ নদীর নাম কাপ্-তাই; “কাপ্” মানে কান্না, “তোই” মানে নদী। অতএব কাপ্তাই (কোপ্তোই) অর্থ অশ্রুনদী। রত্নমাণিক্যের পিতা ধাঙরফা (ধর্মমাণিক্য ? ১৪৫৮খৃঃ) থানাংচিতে প্রাণত্যাগ করেন। উল্লেখ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে বান্দরবানে থানছি নামে একটি স্থান অতীবাদি রয়েছে।

চাকমাদের সাথে ত্রিপুরাদের পিড়াগোষ্ঠির লোকদের মধ্যেই শুধু মিল নয় আরও অনেক ক্ষেত্রে আছে। যেমন চাকমাদের আরাকানস্থ দৈন্যাক এবং ত্রিপুরাদের দেনদাক দফার নামের অর্থ প্রায় সমার্থক অর্থাৎ শব্দগুলির অর্থ চালধারী সৈন্য। এছাড়া চাকমা মেয়েদের পিনোনের সাথে ত্রিপুরাদের ফাইতং দফার মেয়েদের রিনাই, আর চাকমাদের তঞ্চঙ্গ্যা দলের পিনোনের সাথে ত্রিপুরাদের গাবিং দফার মেয়েদের রিনাই-এর রঙ, ডিজাইন ও সাইজ-গত মিল রয়েছে। এই মিল চাকমাদের সাথে এখানকার অন্যান্য উপজাতীয়দের বৈলায় দেখা যায় না।

চাকমারা গাও (নদী) পূজা করে, এটি ত্রিপুরারাও করে। চাকমারা থানমানা পূজা করে। এতে চৌদ্দজন দেবদেবীকে পূজা দেওয়া হয়। আর ত্রিপুরাদের চৌদ্দ দেবতার পূজা করার কথা সর্বজন বিদিত। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী গীতির নাম উভাগীত; তার সুরের সাথে ত্রিপুরাদের উভাগীতের যথেষ্ট মিল আছে। চাকমা রাজবাড়ীতে সংরক্ষিত পুরাতন একটি শীল মোহরে “সিংহ চিহ্ন” অঙ্কিত অবস্থায় আছে। উল্লেখ্য ত্রিপুরার মুদ্রাগুলিতেও সিংহ চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। চাকমা কিংবদন্তীর রাজা বিজয়গিরি, উদয়গিরি, সমরগিরি নামগুলির সাথে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রাজা বিজয় মাণিক্য (১৫৩২-১৫৬৩ খৃঃ), উদয় মাণিক্য (১৫৬৭-১৫৭২ খৃঃ) এবং অমর মাণিক্যের (১৫৭৭-১৫৮১ খৃঃ) নামের সাদৃশ্য আছে। বিজয় মাণিক্যের ত্রিহট্ট বিজয়ী সেনাপতি কালা খাঁ ওরফে কালা নাজিরের সাথে চাকমাদের কালাবাঘা নামক জনৈক সেনাপতির নামের মিল আছে।

ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালার মতে মহারাজ বিজয় মাণিক্য ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দক্ষিণে রামু পর্যন্ত জয় করেন। আর আমরা আরাকানের ইতিহাস থেকে জানতে পারি আরাকান রাজা মেংবোকে উত্তর দিকস্থ ত্রিপুরার দিক থেকে একজন সাক-রাজা ১৫৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ করে রামু পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থেকে চাকমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যে বহুকাল ধরে

পারম্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময় চলে আসছে বলে বিশ্বাস। এমনকি এই দুইটি উপজাতির মধ্যে অতীতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনায় যোগসূত্রও সম্ভবতঃ থাকতে পারে।

তবে চাকমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যে কিছু কিছু অমিলও রয়েছে। যেমন, চাকমারা ত্রিপুরাদের চেয়ে কিছুটা ফর্সা। এ কারণে ত্রিপুরারা চাকমাদেরকে কুরমু (হলদে) রঙের লোক বলে। ভাষাগত দিক থেকে ত্রিপুরারা বৃহত্তর বরো (BODO) ভাষা-পরিবারের লোক। তাদের ভাষার সাথে বরো, গারো, কাছাড়ী, মেচ, রাভা প্রভৃতি ভাষাগুলির মিল রয়েছে। পক্ষান্তরে চাকমাদের ভাষা হিন্দ-আর্য ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। চাকমাদের ভাষার সাথে বাংলা এবং অহমীয়া ভাষাগুলির মিল রয়েছে। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরাদের কোন বর্ণমালা নেই। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী। এসব অমিলের কারণে বহু পূর্ব থেকে চাকমা ও ত্রিপুরারা দু'টি ভ্রাতৃ প্রতিম উপজাতি হলেও প্রথম থেকেই তারা দুটি পৃথক উপজাতি ছিল বলে মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা এসে পড়ে। ভারত-ভাস্কর উপাধি প্রাপ্ত বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর “বাংলাদেশের ইতিহাস” গ্রন্থের মধ্যযুগ অংশে কোচ ও ত্রিপুরা ইতিহাসের উপর গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যক্ত করেছেন।

এ যাবতকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জানা যায় মহারাজ রত্ন মাণিক্যের (১৪৬৪ খৃঃ) পূর্বে মহামাণিক্য ও ধর্মমাণিক্য (১৪৫৮ খৃঃ) নামে দুজন রাজা ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন। ডঃ মজুমদার মহামাণিক্যকে ছেমখুমফা এবং ধর্মমাণিক্যকে ধাঙরফা মনে করেন। উল্লেখ্য মাণিক্য উপাধি ব্যবহারের পূর্বে ত্রিপুরা রাজারা নামের শেষে শান ও অহোমদের মত ফা উপাধি ব্যবহার করতেন। তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বর্তমান পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে উত্তরে কাছাড় জেলার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ ধাঙরফার আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা দক্ষিণে পাহাড়ী অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের কাশালং নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও আরাকানের দিকে ত্রিপুরার অভিযান শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ঐ সময় ত্রিপুরায় মহারাজ ধনুমানিক (১৪৯০-১৫১৪খৃঃ) দেবমানিকা (১৫১৪-১৫২৮ খৃঃ), বিজয় মানিকা (১৫৩২-১৫৬৩ খৃঃ) প্রভৃতি বড় বড় রাজারা রাজত্ব করেন। ধনুমানিকের সেনাপতি চয়চাগ চট্টগ্রাম থেকে আরাকান পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তিনি বাংলার খ্যাতনামা সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) সৈন্যদলকেও দুই দুইবার গোমতী নদীর ঘাটে পরাজিত করেন। রাজা দেবমানিকা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকার সুবর্ণ গ্রাম জয় করেছিলেন। এরপর পুনরায় বিজয়মানিকা চট্টগ্রাম জয় করে রামু পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। অতএব ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় লোকজন পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে আরাকান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর ঐ সময় দীর্ঘকাল ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বরাক নদী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের গবেষণালব্ধ লেখা থেকে মনে হয় ত্রিপুরার প্রথম বাসিন্দারা সম্ভবতঃ বার্মার শান জনগোষ্ঠীর লোক ছিল। এ বিষয়ে Tribal History of Eastern India (1872) গ্রন্থের লেখক E. T. Dalton নিম্নলিখিত তথ্যটি পরিবেশন করেছেন, In the reign of Sukempha the thirteenth sovereign of the empire of Pong (who succeeded his father A. D. 777), his brother Samlonpha, who was the general of his forces, having subjugated Cachar, Tipperah and Manipur, pushed across the hills to the valley of the Brahmaputra and commenced there a series of conquests.^{২০} ...

শানরা সম্ভবতঃ উত্তর বার্মা থেকে মধ্য বার্মা হয়ে ত্রিপুরা, কাছাড় ও মনিপুরে প্রবেশ করেছিল। তাদের পরে চলে আসে বৃহত্তর বরো (BOCO) ভাষাভাষী ক্রং (ত্রিপুরা), রিয়াং ও উসুই জনগোষ্ঠীর লোকেরা। তারা সম্ভবতঃ উত্তর দিকের

২০. E. T. Dalton, Tribal History of Eastern India (1872), p. 1.

আসাম থেকে শুরু করে কাছাড় ইত্যাদি হয়ে ত্রিপুরায় চলে আসে। পরবর্তী-কালে উত্তর দিক থেকে আসা বরো ভাষাভাষী এই দলটিই ত্রিপুরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে বিশ্বাস।

ক্রঃ ও রিয়াংদের বেশ কিছু সময় পরে সম্ভবতঃ বার্মার চীনহিলের দিক থেকে কুকি চীন ভাষাভাষী “হালাম” জাতীয় লোকেরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রিয়াং এবং এই হালাম জাতীয় লোকেরা ত্রিপুরার বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে অংশ নিয়েছিল। পূর্বে ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনীতে ষষ্ঠে পরিমাণ “হসম” সৈন্যও ছিল। ত্রিপুরা, বরো, কাছাড়ী প্রভৃতি ভাষাগুলিতে হাকম, হাসম্ প্রভৃতি শব্দ দিয়ে আসামকে বুঝানো হয়। এ থেকে মনে হয় তৎকালে সম্ভবতঃ আসামের সাথে ত্রিপুরার কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল। মহারাজ ধনুমানিকোর দশজন সেনাপতির মধ্যে নিম্নলিখিত লাইনগুলিতে হসম বিস্তর বলা হয়েছে—

“দশ সেনাপতি মধ্যে হসম বিস্তর।

রাজ সৈন্য আমি মাত্র হই একেশ্বর ॥”^১

উপরোক্ত তথ্যাদির কারণে মনে হয় ত্রিপুরায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক ছিল। চাকমারাও সম্ভবতঃ এককালে ত্রিপুরার নিকটস্থ জীহটে বা ত্রিপুরার আশে পাশে বসবাস করেছিল। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী চাদিগাও ছাড়া পালাগানে নিম্নলিখিত লাইনটি পাওয়া যায়,

নাঙ্গের উল্লাখে রাধামন।

খোই গাঙত পলাকি সৈন্যগণ ॥

(নাচে উল্লাসে রাধামন।

খোয়াই নদীতে পৌছেছে সৈন্যগণ ॥)

ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুরার দিক থেকে চট্টগ্রাম এবং আরাকানে যে সমস্ত অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল ঐ গুলির সাথে চাকমাদের যোগসূত্র থাকা

বিচিত্র নয়। চাকমাদের চাদিগাও ছাড়া পালাগানে তাদের সাথে আরাকান বিজয়ে ত্রিপুরাদের একটি দলও অংশ গ্রহণ করেছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আরাকানের তদানীন্তন Senior Asst. Commissioner, Lt. Phayre আরাকানে মায়ু নদীর তীরে চাকমাদের দৈংমাক ও ত্রিপুরাদের ব্রুং বা ব্রুং নামধারী লোকদেরকে দেখতে পেয়েছিলেন, “The remaining hill tribes are the Doingnuk and the Mrung. They both inhabit the upper course of Mayu river.”^{২২} এখানে উল্লেখ্য যে ত্রিপুরা থেকে আরাকান পর্যন্ত চাকমা ও ত্রিপুরার অজ্ঞাবদি পাশাপাশি ছড়িয়ে আছে।

চাকমা, শাক্য এবং চাক :

উপরোক্ত তিনটি জাতিকেই বর্মীরা সাক্ (Sak) বা থেক্ (Thek) বলে থাকে। এ কারণে চাকমাদের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সেই সাথে শাক্যও চাকদের কথাও এসে পড়ে।

গৌতম বুদ্ধ শাক্যবংশীয় ছিলেন। ভারতবর্ষে এককালে শাক্যদের বাস ছিল। বর্তমানেও নেপালে শাক্য জাতির একাংশ রয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন শাক্যরা মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে History of India গ্রন্থে Vincen Smith সাহেব নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখেছেন, “I think it highly probable that Gautama Buddha, the sage of the Sakyas, and the founder of historical Buddhism, was a Mongolian by birth, that is to say, a hill-man like a Gurkha with Mongolian features, and akin to the Tibetans. Similar views were expressed long ago by Beal and Fergusson, who

২২. Lt. Phayre, Account of Arracan, Journal of the Asiatic Society of Bengal (1841), Vol—X, Part —1, p. 683

used the terms Scythic or Turanian in the sense in which I use Mongolian.”^{২৩}

বর্মীরা মনে করে অতীতে শাক্যদের একটি দল বার্মায় প্রবেশ করেছিল এবং তারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে মিশে গেছে। এ সম্পর্কে Sir Arthur P. Phayre সাহেব History of Burma গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখেছেন, The Indian settlers no doubt, in a few generations, became merged in the country. Only three names have been handed down as borne by original tribes, or the first conjunction of such tribes—that is, Kanran, Pyu or Pru, and Sak or Thek, the last, however is not an original native term but, probably an abbreviation of Sakya, and may have been retained by at least a portion of the earliest Indian settlers and their descendants for sometime. But later, all who joined them were admitted to brotherhood, with the proud designation of Brahma.”^{২৪}

তবে চাকমাজাতি গ্রন্থের লেখক শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয় “দেঙ্গাওয়াদী আরেদ ফুং” নামক একটি আরাবানী ইতিহাস গ্রন্থের বরাতে দিয়ে জানান যে ৫৯৬ মসীতে (১৩৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের দিকে) মধ্য বার্মায় মাইচাগিরি নামে একটি শক্তিশালী সাক রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের রাজা য়েংচো ঐ সময় আরাবান রাজা মেঙ্গাদি (মাংখি)-এর প্রেরিত বিরাট একটি সেনাবাহিনীর হাতে পরাজিত ও স্বপরিবারে তিনপুত্র ও দুইকন্যাসহ বন্দী হয়েছিলেন।^{২৫}

সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয় উক্ত সাক রাজ্যের সাথে চাকমাদের যোগাযোগের এক অভিনব থিওরী দেন। তাঁর মতে উক্ত সাক রাজা য়েংচোর “মইসাং”

২৩. Vincen Smith, History of India (3rd Edition, 1961),p.72

২৪. Sir Arthur P. Phayre, History of Burma (1883),p.5

২৫. সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি (১৯০৯ইং), পৃ:

দেঙ্গাওয়াদী আরেদফুং পৃ: ২৪-২৫।

নামে জনৈক বংশধর আরাকানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত ও ঘটনাবলী পর পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে আলী কদমে এসে চাকমাদের রাজ্য হন। এবং ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে আরাকানের বিরুদ্ধে গোড়ের মুসলিম শক্তির সাহায্য লাভ করেন। তাঁর এই থিওরী চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস ও History of Chakma Raj Family গ্রন্থদ্বয়ের লেখক চাকমা রাজা ভূবন মোহন রায় থেকে শুরু করে জার্মানীর Heidelberg বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ ইংরেজীতে প্রকাশিত Vol. L, No. 1, এর “Chakma and Sak” প্রবন্ধের লেখক Lorenz G. Löffler সাহেবও উপযুক্ত গবেষণা ছাড়াই বেমালুম হজম করে গেছেন।

সতীশ চন্দ্র ঘোষের মত Löffler সাহেবও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক এবং চাকমা দু’টি আলাদা উপজাতিকে নামগত সাদৃশ্যের জ্ঞান একই উপজাতির দু’টি শাখা বলে ধরে নিয়েছেন। অথচ চাকমাদের সাথে চাকদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে একবিন্দুও মিল নেই। এমতাবস্থায় চাকমাদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক ও মধ্য বার্মার সাকদের যোগাযোগের সম্ভাবনা এক প্রকার নেই বললেই চলে। তা’ছাড়া সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয় মইসাং নামক যে রাজাকে সাকরাজ্যে য়েংচোর বংশধর হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন পরবর্তীকালে দেখা গেছে তিনি হলেন আরাকান রাজ মংশোয়েমুন। তিনি ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে একবার রাজ্যচ্যুত হয়ে গোড়ের মুসলিম সৈন্যদের সাহায্যে পুনরায় আরাকানের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। মংশোয়েমুন শাক্য বংশীয় ছিলেন বলে এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

চাকমাদেরকে শুধু বর্মী শাক্যদের বংশধর নয়, কেউ কেউ উত্তরের ভারতীয় শাক্যদের বংশধর প্রমাণ করতেও সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে Dr. Heinz Bechert এর লিখিত Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ নিয়ে তুলে ধরা হলো, “There can be no doubt that the Chakmas have been Buddhists since long. This is well attested by two historical works of Tibetan literature. viz. by Taranatha’s “History of Buddhism in

India” and by Sum-pa mkhan-Po’s works, Assam, Tripura, Arakan, Burma, and some other countries east of India are collectively called “Koki lands.”

... When the Muslims occupied Magadha, a large number of Buddhist monks fled from here to the Koki lands. King Balasundra of this country is said to have sent many pandits to South India in order to procure the Mantrayana literature, i.e. the works of Tantric Buddhism, from Siddha Shantigupta or Shivavamsa. King Balasundra’s son Chandravahana became the king of Arakan (Rakhan), his son Atitavahana became the king of Chakma (Chagma) and his son Balavahana the king of Burma (Munyang) and Buddhism flourished in their countries during this period. mkhan-po. p. 123; Taranatha, p. 263)

এত গেল চাকমাদের সাথে শাক্যদের যোগাযোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা। এবার পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক (Chak) দের কথায় আসা যাক। চাকরা নিজেদের নামের বানান চাকমাদের অনুকরণে বর্তমানে চাক লিখলেও তারা কিন্তু নিজেদেরকে আসলে “আচাক” (Achak) বলে। বার্মার আরাকানেও স্বল্প সংখ্যক চাক রয়েছে। তবে সেখানে চাকদের ভাষার সাথে সমগোত্রীয় আরও অনেক ভাষাভাষী লোক রয়েছে। ১৯৫৯ খ্রষ্টাব্দে Pierre Besaignet নামক জর্নৈক কেনেডীয় গবেষক এখানকার চাকদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখেছেন,

The number of Saks living in the Chittagong Hill Tracts does not go probably beyond a few hundreds. The num-

-
২৬. Dr. Heinz Bechert, Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura, Educational Miscellany, Vol. IV, No. 3 & 4, 1967

ber of Saks, as an ethnic group, living in Arakan, whole be roughly the same ; nearly 700. Yet in Arakan their number as a linguistic group, that : ‘Taman has been included in the Sak group, Malin has also been added, so that this group now consists of Kadu, Ganan, Sak, Daig-net, Tama, and Malin. In the same place is mentioned a “Sak group race” of 51,820 souls We do not understand what is meant by “Sak race.”’^{২৭}

অতএব বার্মাহ সাকদের সাথে চাকমাদেবকে অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকদের সাথে চাকমাদেবকে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত করা আপাততঃ সমিচীন নয়। এ বিষয়ে আরও অনেক বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে বোধ হয়।

চট্টগ্রামের সাথে চাকমাদের সম্পর্ক :

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে চাকমাদের সম্পর্ক কতকাল ধরে চলে আসছে তা বর্তমানে জানার কোন উপায় নেই। তবে মনে হয়, চট্টগ্রামের সাথে চাকমাদের সম্পর্ক বেশ কয়েক শতাব্দীর হতে পারে। চাকমা এবং চট্টগ্রামী উপভাষার (dialect) মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে ব্যাকরণগত বিচারে চাকমা ভাষা চট্টগ্রামী উপভাষার চেয়ে প্রাচীনতর। চাকমাতে পালি ও সংস্কৃতের মত পুরুষ ও বচন ভেদে ত্রিণী-মূলের সাথে আলাদা আলাদা প্রত্যয় যুক্ত হয় যা চট্টগ্রামী উপভাষাতে হয় না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের নাম পুরাতন রেকর্ডপত্রে চাটিগাম (Chatigam) হিসেবে পাওয়া যায়। চাকমারা চট্টগ্রামকে চাদিগাঙ বলে। চাকমা ভাষায় আবার “গাঙ” শব্দের অর্থ গাঁ বা গ্রাম নয়, নদী বুঝায়। যেমন খোইগাঙ (খোয়াইনদী), মনুগাঙ (মনুনদী), বরগাঙ (বড়নদী অর্থাৎ কর্ণফুলী) ইত্যাদি। চাকমাদের বিভিন্ন পালাগানে অতীতের “চাদিগাঙ ছাড়া” নামে একটি পালাগান আছে।

২৭. Pierre Bessaignet, Social Research in East Pakistan (1959), pp. 151-152.

চট্টগ্রামের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন হলেও এ সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য এখনও জানা যায়নি। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে Kirata-Jana-Krti নামক গ্রন্থে যে কথাগুলি লিখেছেন পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিয়ে তা' প্রদত্ত হলো,

Nothing is known about the early history of Chittagong and of the tract in Burma contiguous to it, viz., Arakan. The original inhabitants might have been Austro-Asiatic allied to the Khasis on the one hand and the Mons or Talaiings on the other; possibly they were more closely related to the Mons. Later on, they were overlaid by Bodo-speaking Sino-Tibetans from Comilla and Noakhali in Bengal, and by Kuki-Chin speakers of the same 'race' from the Chittagong Hills. It is not known when the Mran-ma or Burmese-speaking tribes from the northern part of the Irrawaddy valley crossed the Arakan Yoma Mountains and settled in Arakan, and gradually made the whole tract in Burmese in speech.”^{২৮}

কোন জাতীয় লোকেরা প্রথম চট্টগ্রামে এসেছিল তা' জানার কোন উপায় এখন সম্ভবতঃ নেই। পূর্বে চট্টগ্রাম অঞ্চল খুব জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার মোগল সুবাদার শায়েস্তা খানের ছেলে বজ্রগ উম্মেদ খান যখন আরাকানীদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে যুদ্ধ করতে আসছিলেন তখন তাঁকে মাঝপথে জঙ্গল কেটে আসতে হয়েছিল। কাজেই সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতেও চট্টগ্রামের খুব বেশী অঞ্চল-আবাদ হয়েছিল বলে মনে হয় না। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম রহবার আরাকান, ত্রিপুরা এবং বাংলার মুসলিম সুলতানদের মধ্যে হাত বদল হয়েছিল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দের সময় এটি

ত্রিপুরার অধীনে ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে Turbooamah নামক জনৈক বর্মী রাজা চট্টগ্রামের কমিশনারকে যে চিঠিটি দেন, তাতে চট্টগ্রামকে অমরপুরের অধিপতি আশ্বাং ধামাহ (মতান্তরে নারবুংধামাহ) আবাদ করেছিলেন বলে লেখেন। চিঠিটির কিছু অংশ নিয়ে প্রদত্ত হলো। তৎপূর্বে Turbooamah এর চিঠিটির অন্তর্বাদ সম্পর্কে কিছু কথা বলে রাখা দরকার।

এই চিঠিটি প্রথম প্রকাশ করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ইংরেজ জেলা প্রশাসক Captain T. H. Lewin তাঁর The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein গ্রন্থে : ৮৩৯ খৃষ্টাব্দে। তাতে অতীতে চট্টগ্রামে Sery Tumah Chuckah অথবা Sery-Tumah Cuckah নামে একজন শক্তিশালী রাজা রাজত্ব করতেন বলে লেখা আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিঃ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ ‘Bangladesh District Records, Chittagong,’ নামক গ্রন্থে উক্ত রাজার নাম (১) Ser Tumak Chuckma অথবা (২) Serythemah অথবা Sery Tumah Chuckma, তিনি লিখেছেন।

নিম্নে মিঃ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত উল্লিখিত গ্রন্থটি থেকে ঐ চিঠির কিছু অংশ দেওয়া হলো—

I have written unto all the provinces of Arracan with orders to forward this latter in safely to Chittagong, formerly Subject to Rajah Sery Tumak Chuckma by whom the country was cultivated and populated ; and he erected 2,400 places of the Public Worship and made 24 Tanks.

B. Here follows a long list of the Names of places and forts said to have been erected by the above Rajah and by Narbung Dumah Rajah of Omerpoor Provinces to his accession to the Rajagee, ...previous to the Accession of Rajah Serythemah Chuckmah to the Government of

the countries of Rutunpoor, Dootywady, Arracan and Doo-
rapully, Rampully, Chagdooy, Mahadoye, Manceng, in whose
time the country was governed with Justice and Ability
and his wisdom was as the lightning and the People were
happy under his administration I accordingly did,
and moreover erected 6 places of Divine worship and have
conformed myself Strictly to the Laws of Customs of
Sery Tumah Chuckmah governing my people with lenity
and Justice.^{১০}

Received
24th April 1787

A true translate
from the Persian Copy
Signed G.D.
Asst.

চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (মিজোরাম)

আলোচ্য গ্রন্থে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের মিজোরাম অঞ্চলে একটি চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রয়েছে। এ সম্পর্কে ডঃ বি. বি. গোস্বামী তাঁর লিখিত MIZO UNREST (১৯৭৯ ইং) গ্রন্থে নিম্নলিখিত তথ্যাদি প্রকাশ করেছেন,—

1. CHAKMA :

According to 1961 Census, the Chakma tribal population is about 7 per cent of the total population of Mizoram. The bulk of the Chakma population are living in Bangladesh and extend their traditional loyalty to the Chakma royal family of Rangamati, Bangladesh. The Chakmas are immi-

৩৩. Sirajul Islam, Bangladesh District Records, Chittagong,
Vol. 1, pp 106-107.

grants to Mizoram just as the Mizos are. Comparatively the Chakmas are recent immigrants to Mizoram. During Second World War, A Chakma Transport Corps, consisting of the Chakma collies were formed. The constant migration of the Chakmas from across the border is evident from the phenomenal increase in its population. In 1960 a good number, however, migrated from Chittagong Hill tracts being displaced as a result of the implementation of the Kaptai Dam. They, however, were pushed out of Mizo Hills by the Lushai and allied tribes" (Roy Burman 1970 : 87) The Mizos call the Chakmas Takam. (pp. 52-53)

2. After the Independence of India, the Chakmas were involved in the political activities of Mizoram. The Chakmas took part in election of the Advisory Council for the Lushai Hills held in April, 1948. In 1952 they participated in the District Council election by virtue of their residence in Mizo district for more than 12 years. A Chakma was nominated as a member of the District Council in 1952 when the Mizo Union got power. At that time they were recognised as Scheduled Tribe of Mizoram by the Constitution of India. In the subsequent elections, the Chakmas had member in the District Council. They won one seat in the Pawi-Lakher Regional Council election in 1964 and two in 1970. In 1972,3 Chakmas from the Congress Party got elected to Assembly of the Union Territory of Mizoram. In 1970 the Chakma tribal candidates played a

decisive role in putting a party in power in the Mizo Hills District Council. (p. 55)

3. During the time of last (1960-famine (mautam)), just before the out break of MNF unrest, the Chakmas bore serious grievances against the Mizos, for depriving them of the economic benefits and neglecting them because of their being non-christians. They have, therefore, been demanding a separate district council of their own. This was attained after the formation of the Union Territory of Mizoram in 1972 with Borapanswri as its headquarters. (p. 56)

চাকমাদের আগমনের দিক নির্ণয় :

চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে উত্তর দিক থেকে না দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিল নিম্নের তালিকাটি থেকে তার সম্ভাব্য উত্তর পাওয়া যাবে।

ক্রমিক বিষয় উত্তর দক্ষিণ বিবরণ

১। ভাষা ✓ × চাকমা ভাষার সাথে পালি, প্রাকৃত, বাংলা এবং অহমীয়ার মিল আছে। চাকমাতে শতকরা ২/৩টিও বর্ষাশব্দ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

২। বর্ণমালা ✓ × চাকমা ও আহোম (আসাম) বর্ণগুলি একই পরিবারভুক্ত। বর্মী ও আরাকানী বর্ণগুলির সাথে চাকমা বর্ণের সাদৃশ্য আছে। তবে বর্মী ও আরাকানী বর্ণগুলি অ-কারান্ত আর চাকমা ও আহোম বর্ণগুলি আ-কারান্ত।

ক্রঃ বিষয় উত্তর দক্ষিণ বিবরণ

৩। পোষাক পরিচ্ছদ V X



চাকমা পুরুষেরা ধুতি ও গামছা পরে। পক্ষান্তরে বর্মীরা লুঙ্গি পরে। চাকমা মেয়েদের পিনোনের সাথে ত্রিপুরাদের ফাতুং দফার পিনোনের মিল আছে এবং চাকমাদের অস্থ একটি দল তকুঙ্গাদের পিনোনের সাথে ত্রিপুরাদের গাবিং দফার পিনোনের মিল আছে। পক্ষান্তরে বর্মী ও আরাকানী মেয়েরা থামি পরে।

৪। পূজাপার্বন V X

চাকমাদের গাউপূজা, হোইয়াপূজা, থানমানা প্রভৃতির সাথে আসাম ও ত্রিপুরায় প্রচলিত বিভিন্ন পূজার সাদৃশ্য আছে। পক্ষান্তরে বর্মী ও আরাকানীরা ঐসব পূজা করেনা। চাকমাদের ধর্মকাম বা জাদিপূজার গতিও উত্তর অথবা দক্ষিণ স্পর্শ নয়। এটিকে দক্ষিণের মনে করা যেত যদি না উত্তরে আসামের দিকে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মপূজা এবং অনেক হিন্দুর মধ্যে ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচলিত না হতো।

৫। ধর্ম : (বৌদ্ধধর্ম) X

চাকমারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। চাকমা ভাষায় ধর্ম বিষয়ক যে সমস্ত শব্দগুলি পাওয়া যায়, যেমন—ভাস্তে (বৌদ্ধ ভিক্ষু), ক্যং (বৌদ্ধ মন্দির), স্থং (ভিক্ষুদের আহার), ফাং (ভাস্তেকে গৃহে আমন্ত্রণ) ইত্যাদি বর্মী ও আরাকানী ভাষা থেকে উদ্ভূত। পক্ষান্তরে চাকমারা অনেক সময় বুদ্ধকে “গৌঙেই” অথবা “গোবেন”, ভাস্তেকে “ঠাঙর” ইত্যাদি

ক্রঃ বিষয়

উক্তর দক্ষিণ বিবরণ

যে সমস্ত শব্দ বলে ঐগুলি মূলতঃ কতগুলি
হিন্দুধর্মে ব্যবহৃত শব্দ, যেমন—

গৌসাই>গৌয়াই>গৌয়েই/গোঙেই।

গৌসাই>গোসাইন>গোঝেন।

চাকুর>চাণ্ডর।

- ৬। বিবাহ অনুষ্ঠান ✓ × চাকমাদের বিয়েতে চুঙুলাং পূজা করা হয়। এই পূজায় দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে ১টি মোরগ ও ২টি মুরগী বলি দেওয়া হয়। দেবদেবীদের মধ্যে হুজন দেবদেবীর নাম যথাক্রমে কালাইয়া (মহাকাল=শিব) ও পরমেশ্বরী (প্রকৃতি=দুর্গা)। চাকমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে একটি শুভ্র কাপড় দিয়ে বর ও কনেকে জোড় বাঁধা হয়। বর্মী ও আরাকানীদের এ রকম কোন রীতি নেই। তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর সাথে কনের ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী যুক্ত করে দেওয়া হয়।
- ৭। বিষ্ণু (<বিষ্ণু) উৎসব ✓ × চাকমারা বাংলা বর্ষের শেষে বিষ্ণু উৎসব পালন করে। আসামে এটি “বিহু” নামে পরিচিত। আরাকানে “সাঁংক্রাঁইং” নামে। যে উৎসব ঐ সময় অথবা তার কাছাকাছি সময়ে করা হয় তা মূলতঃ “জলকেলি উৎসব”। “সাঁংক্রাঁইং” শব্দটির সাথে বাংলার চৈত্র-সংক্রান্তি শব্দটির হয়তো ব্যুৎপত্তিগত যোগাযোগ থাকতে পারে।
- ৮। জুম ও তাগল ✓ × চাকমা এবং অন্যান্য উপজাতীয় লোকেরা পূর্বে পাহাড়ের ঢালু স্থানে বনজঙ্গল কেটে ও রৌদ্রে

জ্বলানোর পর ওগুলি পুড়িয়ে সেখানে যে ধরনের বিশেষ (Slash and burn) চাষ করতো তা' চাকমা ভাষায় “জুম” চাষ বলে। আর যে ছুঁচালো দা দিয়ে জুম চাষ করা হয়, তার নাম চাকমা ভাষায় “তাগল”। চাকমাদের “জুম” শব্দটি আসামের “জুম” (<জাহোম) শব্দ থেকে এবং “তাগল” শব্দটি আসামের “টাকাল” শব্দ থেকে এসেছে। নমী ও আরাকানীরা “জুম” কে যা (ya) এবং তাগলকে “দাও” বলে। ত্রিপুরারা জুমকে “হোক” বলে। চাকমারা বাদে কোন উপ-জাতি “জুম” কে “জুম” বলে না।

৯। খাড়াভ্যাস :

- (১) আরাকানী বংশোদ্ভূত প্রায় উপজাতীয় লোকেরা চুরুট টানতে ভালবাসে। পক্ষান্তরে চাকমাদের চুরুট টানার অভ্যাস নেই।
- (২) আরাকানীরা বিভিন্ন ধরনে তরকারি দিয়ে নানা ধরনের স্ন্যপ খায়; যা চাকমা দের মধ্যে প্রচলন নেই। আরাকানী বংশোদ্ভূত অনেকেই গোবরে পোকার শুককীট খায়; যা চাকমারা খায় না।
- (৩) আরাকানীদের মধ্যে খাবার সময় বাটির ব্যবহার অধিক দেখা যায়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য প্রত্যেক তরকারির ক্ষেত্রে আলাদা বাটি থাকে। যা চাকমাদের বেলায় দেখা যায় না। চাকমাদের খাবার সময় চামচের ব্যবহার অধিক হয়ে থাকে।

চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি

ইতিহাসের বিচিত্র গতিতে অনেক জাতি এবং মহাজাতির অনেক উত্থান ও পতন ঘটেছে। সময়ের আবর্তনে অনেক নব্য জাতির যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি অনেক প্রাচীন জাতিও কালের করাল গ্রাসে ধ্বংস হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয়। আর তাই তিন লক্ষাধিক জনসংখ্যা নিয়ে চাকমা নামক ক্ষুদ্র উপজাতিটি এখনও পর্যন্ত কালের করাল গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিভাবে যে বেঁচে আছে তার অস্তুনিহিত উত্তর সম্ভবতঃ চাকমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির দৃঢ়তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

চাকমাদের এই ঐতিহাসিক সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা সম্ভবতঃ এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে আমার পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হবেনা। তাই এ বিষয়ে লেখার শুরুতেই পাঠকের কাছে কমা চেয়ে নিয়ে লেখনী ধরলাম।

পারিবারিক এবং সামাজিক কাঠামো :

চাকমাদের পারিবারিক কাঠামো পিতৃ প্রধান। পরিবারে পিতার মতামতই চূড়ান্ত। আর সমাজ জীবনে চাকমাদের জাতীয় প্রধান হলেন রাজা। এ যাবতকাল পর্যন্ত রাজ্যে কেন্দ্র করে চাকমা সমাজ গড়ে উঠেছে এবং আবর্তিত হয়েছে। প্রথমে আসে গ্রাম। গ্রামের প্রধান হলেন কার্বারী ; তিনি গ্রাম্য লোকদের ঝগড়া ঝাটের নিষ্পত্তি ও বিচার করে দেন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি মৌজা। মৌজার প্রধান হলেন হেডম্যান (Headman)। তিনি জন-সাধারণের মধ্যে ভূমির বন্দোবস্ত দেন এবং তাদের কাছে খাজানা উত্তোলন করেন।

আর কোন মামলা তাঁর কাছে এলে অথবা কার্ভারীর রায়ের বিরুদ্ধে কেউ আপীল করলে তিনি তা' নিষ্পত্তি করে দেন। হেডম্যান জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং রাজা কর্তৃক মনোনীত হন। তিনি রাজা ও কার্ভারীর মধ্যে যোগসূত্র হয়ে কাজ করেন।

অতীতে ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে চাকমা সমাজে হেডম্যান নামক কোন পদ ছিল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার যখন এ জেলাকে কয়েকটি মৌজায় বিভক্ত করে প্রতিটি মৌজায় রাজস্ব আদায় ও শাস্তি রক্ষার জন্য একজন করে হেডম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করেন তখন থেকেই এ পদটি চালু হয়েছে। মূলতঃ এই পদের নাম Headman (হেডম্যান) আরাকানীদের “রোয়াজা” শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে নেওয়া হয়। আরাকানী ভাষায় “রোয়া” অর্থ গ্রাম এবং “রোয়াজা” অর্থ গ্রাম্য প্রধান। এখানে উল্লেখ্য যে চাকমারা গ্রাম্য প্রধানকে কার্ভারী বলে।

পূর্বে চাকমা সমাজে ধামাই, চেগে খীঝা ইত্যাদি পদধারী ব্যক্তির সমাজ শাসন করতেন। মনে হয়, পরবর্তীকালে ধামাই ও চেগে পদ দুইটি লুপ্ত হয় এবং তদস্থলে কোন এক সময় “দেবান” নামের নূতন একটি পদের সৃষ্টি হয়।

বিগত দুই শতাব্দিক বঙ্গের পূর্ব থেকে দেবান ও খীঝা পদধারী ব্যক্তির চাকমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয়। এছাড়া চাকমাদের অগ্রতম শাখা তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে “আমু” নামে একটি পদ প্রচলিত ছিল।

এ বিষয়ে চাকমাদের গঝা, গুন্ডি প্রভৃতি দলের কথা এসে পড়ে। চাকমা ভাষায় বংশ বা গোষ্ঠীর প্রতিশব্দ হলো গুন্ডি। আর কয়েকটি গুন্ডি মিলে যে দল গঠিত হয় তার নাম গঝা। ধামেই, চেগে, লার্মা, বগা, কুরাকুত্যা, মুলিমা, বোর্বুয়া, ওয়াংঝা, লচর, রাঙী, খিয়ংজী, বুং, ফাক্সা প্রভৃতি নামে চাকমাদের অনেকগুলি গঝা এবং সেই সাথে অজস্র গুন্ডি রয়েছে। পূর্বে প্রত্যেক গঝায় অথবা কয়েকটি গঝার উপর এক বা একাধিক দলপতি থাকতেন বলে মনে হয়। এ কারণে চাকমাদের গঝা শব্দটি আরাকানীদের “গং-সা”

শব্দ থেকে উদ্ভূত হতে পারে বলে মিঃ অশোক কুমার দেওয়ান (পরিচালক উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট) মনে করেন। আরাকানী ভাষায় গং অর্থ সর্দার এবং ‘সা’ শব্দ যোগে লোক এবং সম্ভান উভয়ই বুঝায়। এই হিসাবে ‘গংসা’ শব্দযোগে পূর্বে সম্ভবতঃ “কোন দলপতির লোক” বুঝানো হতো। উল্লেখ্য তৎকালে রাজার সাথে ঐ সমস্ত দলপতিদেরই সম্ভবতঃ যোগা-যোগ থাকতো। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের দিকে চাকমা রাজ্যটি সম্ভবতঃ আরাকান রাজ্যের অধীনে ছিল। কাজেই উক্ত সময়ে চাকমাদের উপর আরাকানীদের প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে মারমাদের মধ্যেও অনেক ধরনের গঝা রয়েছে। তবে তারা দলের শেষে গঝা (<গং-সা?) না বলে কেবল ‘সা’ শব্দটি যুক্ত করেন যেমন, প্ল্যাংসা, রিগ্রীসা, লংকাডু-সা ইত্যাদি। এ থেকে চাকমাদের গঝা (<গংসা?) শব্দের অন্ত্যস্থিত “ঝা”-এর উচ্চারণ মারমাদের ‘সা’ থেকে এসেছে বলে মনে হয়।

গঝা শব্দের অর্থ আদিতো দলপতি বোধক হলেও যেমন ধামেই-গঝা, চেগে-গঝা, ওয়াংঝা-গঝা ইত্যাদি, পরবর্তীকালে স্থান ও নদীর নামানুসারে আরও অনেক গঝার নামকরণ হয়েছিল বলে মনে হয়; যথা—

- তৈন্থা-গঝা : তৈনছড়ী একটি নদীর নাম
 মুলিমা-গঝা : মুরি (মাতা-মুহুরি) নদীর নাম।
 লার্মা-গঝা : লামা একটি স্থানের নাম।

আবার অনেক গঝার নাম পেশা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন। এগুলি হলো,—

- বোর্বুয়া-গঝা : এরা বড়ুাদের কাজ করতো বলে জনশ্রুতি আছে।
 লচ্চর-গঝা : এরা লঙ্করের কাজ করতো বলে অনেকে মনে করেন।
 কুরাকুতা-গঝা : এরা রাজ-অভিষেকে কুরা (মোরগ) কেটেছিলেন বলে জনশ্রুতি শোনা যায়।

এগুলি বাদে অনেক গম্বার নামে আবার ব্যক্তির চরিত্রের প্রাধান্য থাকতে পারে, যেমন—

- ১। কুতুগা-গম্বা (সজ্জার-দল) : প্রচলিত জনশ্রুতি মতে এই গম্বার সর্দারের চুলগুলি নাকি সজ্জার কঁটার মত সোজা এ কারণে তার দলের নাম কুতুগা-গম্বা।

একবার নাকি কোন এক রাজা একটি তীব্র স্রোতবতী পাথুরে ছড়া (নদী) দেখে ঘোষণা করেন যে ঐ ছড়ার সাত বাঁক একটুও আছাড় না খেয়ে যে সাতবার দৌড়িয়ে আসা যাওয়া করতে পারবে তিনি তাকে নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দেবেন। কুতুগা-সর্দার নাকি ঐ ছড়ার সাত বাঁক দৌড়ে আসা যাওয়ার সময় সামান্য একটু আছাড় খেয়েছিলেন এ কারণে রাজা তাঁকে আর নিজের মেয়ে বিয়ে দিলেন না। তবে তাঁকে দেবান (দেওয়ান) পদ দিলেন। সেই থেকে তাঁর দলের লোকেরা কুতুগা-গম্বা।

- ২। বগা-গম্বা (বক-গম্বা) : বগা-গম্বার আদি সর্দার যিনি ছিলেন তাঁর নাকি গলা ও পা গুলি বকের মত লম্বা ছিল। আর দেহের রঙও এত বেশী ফর্সা ছিল যে তাঁকে বকের মত সাদা মনে হতো।

এ গেল গম্বাগুলির কথা। এবার গুন্ডিগুলির কথায় আসা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে চাকমা সমাজে গম্বার চেয়ে গুন্ডির গুরুত্ব অধিক। বিশেষতঃ জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহে গুন্ডির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল—

- ক. শিশুর জন্মের সময় প্রসূতীকে স্বামীর ঘরে অথবা স্বামীর গুন্ডির (বংশের) নিকটস্থ কোন আত্মীয়ের ঘরে সন্তান প্রসবের জন্তু নেওয়াই রীতি। নিজের গুন্ডির বাইরে অন্য লোকের ঘরে শিশু প্রসব করা চাকমাদের রীতি বিরুদ্ধ। এতে শিশুর বংশ মর্যাদা কুঙ্গ হয় এবং অনেকে শিশুর উপর কুপ্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেন। আর নিজের বংশের বহিষ্ঠিত কোন লোকের বাড়ীতে সন্তান প্রসব করলে তিনিও খুশী হননা।

তঁারও এ থেকে অমঙ্গল লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কারণে ওঝা ডেকে তঁার পরিবার সূদ্ধ তাঁকে মন্ত্রপূত করে পবিত্র হওয়ার যাবতীয় খরচ শিশুটির পিতাকে জরিমানা হিসেবে বহন করতে হয়। এ কারণে এ ঝামেলা অতেরাও সহজে যেচে কাঁধে তুলে নিতে চান না।

খ. বিবাহের সময় চাকমাদের স্বগুণ্ডিতে সাত পুরুষ পর্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ। বর্তমানে অবশ্য পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত এই রীতি শিথিল করা হয়েছে।

গ. মৃত্যুর সময় যে কোন ব্যক্তির স্বগুণ্ডির কারো না কারো বাড়ীতে মরাই রীতি। অগ্নি গুণ্ডির লোকের বাড়ীতে কোন ব-ক্তি মরমর হলে তখন সেই পরিবারের লোকেরা মৃত্যুর আগে তাকে তাদের ঘরের চালের বাইরে উঠানে নামিয়ে দেয়। তা না হলে তাদের বাড়ীতে মারা গেলে ঐ বাড়ীতে “ফি” (আপদ-বিপদ) লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে চিতায় মৃতদেহকে মুখাণ্ডি করার প্রথম দায়িত্ব পরে তার ছেলে অথবা বংশের লোকদের।

অতএব এ থেকে দেখা যাচ্ছে চাকমা সমাজে গঝার গুরুত্ব কী অপরিসীম। এ কারণে সম্ভবতঃ Sir Risely সাহেব চাকমাদের সম্পর্কে তঁার Tribes and Casts of Bengal গ্রন্থে ১৭০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখেছেন,

“Among the Chakmas, as perhaps among the Greeks and Romans in the begining of their history, the sect is the unit of the tribal organization for certain public purposes.”^{৩১}

আলোচ্য গঝা-গুণ্ডি আলোচনা শেষ করার আগে এ সম্পর্কে আরো কিছু বিষয় আলোচনা করতে হয়, যেমন দেবান। মনে হয়, পূর্বে প্রত্যেক গঝার উপর এক একজন দলপতি (খীঝা) যখন গঝার নেতৃত্ব দিতেন তখন কয়েকটি গঝার উপর একজন করে দেবান কোন এক সময় রাজারা নিযুক্ত করেছিলেন। এ কারণে ব্রিটিশ আমলের (১৮৬০-১৯৪৭ খৃঃ) পূর্বে ও পরে চাকমা সমাজের জাতীয়

কাঠামো নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে মনে হয়,

ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামো			রাণী কালিন্দীর প্রবর্তিত	ব্রিটিশদের প্রবর্তিত
" (১৯৩২-খৃঃ পূর্বে)			কাঠামো	কাঠামো(১৮৭০খৃঃ পরে)
রাজা	রাজা	রাজা (Chief)		
দেবান	তালুকদার (মন্ডা-তালুক	হেডম্যান (মোজা প্রধান)		
	প্রধান)			
খীঝা (গঝা-প্রধান)	খীঝা	কার্বারী (গ্রাম্য-প্রধান)		
(*কতগুলি গুতি নিয়ে				
একটি গঝা গঠিত)				

উপরে প্রদত্ত চাকমাদের সামাজিক কাঠামোগুলি থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তা' হলো রাণী কালিন্দী তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে (১৮৩২-৭৩ইং) পূর্ববর্তী চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামোতে সামান্য রদবদল করেন। তিনি দেবান পদটি উঠিয়ে দেন এবং প্রজাদেরকে কতগুলি মন্ডা তালুকে বিভক্ত করে প্রত্যেক তালুকের উপর একজন করে তালুকদার নিযুক্ত করেন। তৎপরে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে কতগুলি মোজায় বিভক্ত করে প্রত্যেক মোজায় একজন করে হেডম্যান (Headman) এবং প্রত্যেক গ্রামে একজন করে কার্বারী নিযুক্ত করেন। বর্তমানে এই কাঠামোটিই চালু রয়েছে। তবে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রভাবশালী দেওয়ানদের তালে পড়ে ব্রিটিশ সরকার চাকমা রাজ্যকে ৯টি বৃহত্তর অঞ্চল ভিত্তিক তালুকে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক তালুকে একজন করে "তালুক দেওয়ান" নিযুক্ত করেন। ফলে পূর্বোক্ত কাঠামোতে আরও একটু রদবদল হয়ে "রাজা-তালুক দেওয়ান-হেডম্যান-কার্বারী" এই কাঠামোটি ১৮৯২খৃঃ থেকে চাকমা সমাজে চালু হয়। তবে তা' দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

পূর্বে চাকমা রাজ্যে সম্মানিতদের মধ্যে একমাত্র দেবান, তালুকদার, খীঝা, কার্বারী, বৌদ্ধ পুরোহিত এবং অসহায়দের মধ্যে পঙ্গু, বিধবা, বিপত্নীক ও চিররোগীরা খাজানা দেওয়া থেকে মুক্ত ছিলেন। খীঝাদের রাজপুণ্যাহর সময় রাজাকে এবং উল্লেখযোগ্য শুভ অনুষ্ঠানাদিতে দেবানদেরকে বাঁশের চৌকায় এক চৌক্য মদ, একটি হাটপুষ্ট মোরগ ও এক আকচলী (.৪/১৬ সের) চাল

দিতে হতো। বাদবাকী সকল জুমিয়া পরিবারকে পরিবার পিছু ৪ টাকা জুমকর ও ৪ দিন বেগার খাটতে হতো। কেউ বেগার খাটা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাকে অতিরিক্ত ১ টাকা জুমকর দিতে হতো। এই বেগার বা ১ টাকা রাজপ্রতিনিধি হিসেবে হেডম্যান ভোগ করেন। তিনি প্রতি ৪ টাকা জুমকর থেকেও ১ টাকা পান এবং তাঁর এলাকায় ২৫ একর “সাব্বিস ল্যাণ্ড” বিনা খাজানায় ভোগ করতে পারেন।

পূর্বে চাকমা সমাজে প্রজাদের খাজানা বাদেও শিকারের সময় কোন বণ্ড পশু বধ করলে যে কোন শিকারীকে রাজার কাছে ঐ শিকারের রাণ পাঠিয়ে দিতে হতো। এক্ষেত্রে রাজবাড়ী যদি শিকারের স্থান থেকে অধিক দূরে হয়ে থাকে তবে শিকারীকে রাজার পরিবর্তে তৎপ্রতিনিধি হেডম্যানকে পাঠিয়ে দিতে হতো। তা’ না হলে তজ্জগু তাকে নিম্নলিখিত অর্থদণ্ড প্রদান করা হতো—

শূকরের রাণের জগু —	৫ টাকা
হরিণের রাণের জগু—	১৫ টাকা
সম্বরের রাণের জগু—	২৫ টাকা
গয়ালের রাণের জগু—	৫০ টাকা ইত্যাদি। ^{৩২}

উল্লেখ্য চাকমাদের শিকারের রীতি অনুযায়ী শিকারীই সব সময় শিকারের (এক্ষেত্রে পশুটির) মাথা পেয়ে থাকে। এটি তার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধির জগু প্রাপ্য। এছাড়া ঐ শিকারের পিঠের একাংশের মাংসও খীষাকে দিতে হতো।

কোন মোজায় কোন বাদী হেডম্যানের কাছে কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে চাইলে তাকে প্রথমেই ১ টাকা নজরানা স্বরূপ হেডম্যানকে দিতে হতো। বৃটিশ আমলে হেডম্যান দোষীকে ২৫ টাকার মত

৩২. শ্রী বন্ধিমকুশ দেওয়ান, চাকমা জাতীয় বিচার, উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা
১ম সংখ্যা (১৯৮২ইং), পৃঃ ৭/১৮।

অর্থদণ্ড দিতে পারতেন এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের আদেশ প্রাপ্তি পর্যন্ত আসামীকে আবদ্ধ রাখতে পারতেন। বিভিন্ন গুণ্ডা অনুষ্ঠানাদিতে, বিশেষতঃ বিবাহের সময় তাঁকে এক বোতল মদ, এক বিড়া পান এবং ৮টি সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ করা প্রজাদের করণীয় রীতি ছিল।

গ্রামদেশে হেডম্যান ও কার্ভারীগণ বাদে আরও কিছু লোক সম্মান পেয়ে থাকেন, তাঁরা হলেন, ভস্তে (বৌদ্ধ ভিক্ষু), লুরি বা রাউলী (এক শ্রেণীর বৌদ্ধ ভিক্ষু) এবং বৈজ (ওয়া) গণ।

সচরাচর গ্রামদেশে কেউ যদি কোন অসামাজিক কার্যকলাপ যথা :—অবৈধ বিবাহ, ব্যভিচার, চুরি, পর সম্পত্তি গ্রাস ইত্যাদি করে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে কার্ভারীর কাছে প্রথমে নালিশ দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তির অপরাধ যদি মারাত্মক হয় যথা—নারী ধর্ষণ অথবা খুন খারাবি গোছের তবে ঐ মোকদ্দমা তিনি হেডম্যানের মাধ্যমে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। আর যদি অভিযোগ গুলি অসামাজিক কার্য কলাপের পর্যায়ভুক্ত হয় তবে বাড়ীতে বাদী, বিবাদী এবং গ্রামের গণ্যমান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে বিচার সভা বসে। সেখান দোষীর বিচার ও শাস্তি দেওয়া হয়।

সচরাচর ব্যভিচারের ক্ষেত্রে কোন পুরুষ ও স্ত্রীলোক অভিযুক্ত হলে এবং অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তবে উভয়কেই অসামাজিক কার্য কলাপের জন্য শাস্তি হিসেবে একটি শূকর জরিমানা করা হয়। অধিক দোষীকে (প্রায় ক্ষেত্রে পুরুষটিকে) ঐ শূকরের $\frac{১}{৫}$ ভাগ অর্থ এবং কম দোষীকে (প্রায় ক্ষেত্রে স্ত্রী লোকটিকে) $\frac{১}{৫}$ ভাগ অর্থ বহন করতে হয়। অনেক সময় ঐ শূকরের মাংস উভয়কেই ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতে বাধ্য করা হয়। অনেকে আবার অপরাধীদেরকে কৃতকর্মের জন্য অতিরিক্ত লজ্জা দেওয়ার ব্যবস্থা হিসেবে মুরগীর বাসা (অধক) তাদের গলায় টাঙ্গিয়ে দিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অবৈধ বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী-লোকটিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয়। আর উভয়কে ঐ অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য শাস্তি স্বরূপ একটি শূকর

জরিমানা করা হয়। চাকমা সমাজে পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত যে কোন বিবাহ নিষিদ্ধ এবং নিম্নের সম্পর্কগুলির মধ্যে বিবাহ হতে পারেনা—

- ১। চাচাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ
- ২। খালা, ফুফু, ভাগ্নী, ভাইঝি সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ
- ৩। আপন স্ত্রীর বড়বানের সাথে স্ত্রীর জীবিতকালে অথবা মৃত্যুর পরে বিবাহ নিষিদ্ধ।

কেউ যদি ঐ জাতীয় বিয়ে করে তবে সে বিয়ে সমাজে অবৈধ। পূর্বে ব্রিটিশদের এ জেলায় আগমনের পূর্বে কেউ ঐ জাতীয় অবৈধ বিয়ে করলে তাদের চাকমা রাজ্যে কোথাও কোন স্থান ছিল না। যে ওঝা বরকনের অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত ঐ জাতীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে চুঙুলাঙ পুজায় পৌরহিত্য করতো, তার ওঝাগিরি চিরতরে বাতিল করে দেওয়া হতো; অপরাধ অবশ্য লঘু হলে শাস্তি কিছুটা কম দেওয়া হয়। আর খুন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদির বেলায় অতীতে চাকমা সমাজে সম্ভবত কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বাঁধলে গ্রামের মুকুব্বীরা তা মিটমাট করে দেয়। চাকমাদের রীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তার ছেলেরা। তার জীবদ্দশায় ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং কন্যাকে কোন সম্পত্তি দিয়ে না গেলে তবে তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রী এবং মেয়েরা তার কোন সম্পত্তির ভাগ পায় না। চাকমাদের রীতি অনুযায়ী পিতার মৃত্যুর পর তাদের মায়ের এবং অবিবাহিত বোনদের যাবতীয় দায়িত্ব ছেলেদেরকে কাঁধে তুলে নিতে হয়। অবশ্য বোনদের বিয়ে দেওয়ার পর তাদের ব্যাপারে ছেলেদের আর দায়িত্ব থাকেনা। তবে কোন ভাই অথবা বোন চির ক্লম্ব হলে তার দায়িত্ব ছেলেদের কারো না কারোর নিতে হয়।

চাকমা সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং পরিবারের কতগুলি সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। যেমন পূর্বকালে (চাদিগাঙ ছাড়া পালা অনুসারে)

ঘটকের সময় প্রত্যেক গ্রামকে পরিবার পিছু একজন করে যোদ্ধা রাজাকে দিতে হতো। নূতন রাজাদের রাজ্যাভিষেকের সময় দেবান এবং তালুকদারদের রাজাকে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাতে হতো।

প্রত্যেক গ্রামে গ্রামবাসীদেরকে পরিবার পিছু প্রতি সপ্তাহে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহ্বানের জঙ্ঘ কাঙ-এ (মন্দিরে) স্নান (আহার) সরবরাহ করতে হয়। তা' না করা সমাজে নিন্দনীয় বিষয়। গ্রামে কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করলে প্রসূতীকে কমপক্ষে এক বেলার আহ্বানের জঙ্ঘ ভাত-তরকারী সরবরাহ করা প্রত্যেক গ্রহিনীরই কর্তব্য। কেউ খান কাটা, তোলা অথবা লাগানোর সময় গ্রাম বাসীদের কাছে সাহায্য চাইলে তাকে সবাই একদিন গিয়ে ঐ কাজে সাহায্য করতে হয়। চাকমা সমাজে এর নাম 'মালেইয়া ডাগানা'। পূর্বে অহোমদের মধ্যে "খেল" নামে কতগুলি কারিগরী সম্প্রদায় এবং "মেল" নামে কতগুলি বিশেষ এলাকা ছিল। চাকমাদের "মালেইয়া" শব্দটির সাথে সম্ভবতঃ "মেল" শব্দটি আদিত জড়িত ছিল এবং এক মেলের লোকেরা অন্য মেলের লোককে সাহায্যের জন্য ডাকার নামই সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে "মালেইয়া ডাগানা" বলা হতো।

এবার গ্রামজীবনে প্রতিটি বাসিন্দার কতগুলি সাধারণ অধিকারের কথা আলোচনা করা যাক।

১। পূর্বে চাকমাদের মধ্যে জমির কোন বন্দোবস্তী ব্যবস্থা ছিল না। সচরাচর কেউ চাষাবাদের জন্য বিশেষতঃ জুম চাষের জন্য কোন জায়গা বেছে নিলে সে তথায় বাঁশের একটি ফালা মাটিতে পুঁতে তার উপর আড়া-আড়ি ভাবে আরও একটি বাঁশের ফালা বেঁধে দিত। এতে ঐ জায়গায় তার জুম চাষ করার অধিকার বর্তায়। ঐ ভাবে আড়াআড়ি করে বাঁশের ফালা দেওয়াকে চাকমারা "সাগা" দেওয়া বলে। এরপর কেউ যদি তার সাগা দেওয়া জায়গায় জুম চাষ করতে যায় তবে শেষোক্ত ব্যক্তিকে সামাজিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আর ঐ জায়গাটিকে পূর্বোক্ত ব্যক্তির "দরাজুম" বলা হয়।

- ২। কোন জায়গায় কেউ জুম করার পর যদি ঐ জায়গাটি “রান্যা” অবস্থায় পড়ে থাকে, তবে ঐ জায়গায় উপর তার অধিকার বলবৎ থাকে। জুম থেকে ফসল তোলার পর জুমে যে অবস্থাটা বিরাজ করে তার নাম “রান্যা”। ঐ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি যদি পূর্বোক্ত ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে এখানে সাগা দিতে যায় তবে সামাজিক বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
- ৩। জঙ্গলে বুনো ওল, বাঁশকোড়ল, মধু ইত্যাদি যে ব্যক্তি আগে দেখে থাকে ঐ গুলির উপর তার মালিকানা বর্তায়।
- ৪। গ্রাম জন চলাচলের জন্য সাধারণ রাস্তা, খাবার পানির কূয়া এবং সাধারণ গৌচারণ ক্ষেত্র সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকে। উল্লেখ্য পূর্বকালে প্রত্যেক গ্রামে গো-মহিষ চরানোর জন্য কিছু জায়গা সব সময় খাস রাখা হতো।
- ৫। কোন গ্রামের লোক দলবদ্ধ হয়ে হরিণ, শূকর, সম্বর ইত্যাদি শিকারে গেলে যে ব্যক্তি প্রথম শিকারকে দেখতে পায় সে যদিও ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে তবুও তাকে শিকারের এক ভাগ মাংস দিতে হয়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যে শিকারীর গুলিতে প্রথম শিকার আহত অথবা নিহত হয়, তার সম্মান স্বরূপ উক্ত শিকারের মাথা, চামড়া, কলিজা, একটি রাগসহ ঐ শিকারের এক তৃতীয়াংশ মাংস প্রাপ্য। বাকী দু’তৃতীয়াংশ মাংস অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে নেয়। এছাড়া শিকারে ব্যবহৃত ঐতোকটি বন্দুকের জন্য ঐ গুলির মালিকেরাও অন্যান্যদের সম পরিমাণে এক ভাগ মাংস পেয়ে থাকে।
- ৬। চাকমারা পিতৃপ্রধান। তাই যাবতীয় সম্পত্তি একমাত্র পিতার এবং তার অবর্তমানে তার ছেলেদের। তিনি জীবিত অবস্থায় তাঁর স্ত্রী অথবা মেয়েদেরকে কোন সম্পত্তি দিয়ে না গেলে তারা কিছুই পায় না।

তবে ছেলেরা পিতার অবর্তমানে তাদের মায়ের ভরণপোষণ করে এবং অবিবাহিত বোনদের ভরণপোষণের দায়িত্বও গ্রহণ করে। অবশ্য বিয়ের পর বোনদের প্রতি তাদের আর কোন দায়িত্ব থাকে না।

- ৭। সমাজ জীবনে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার একমাত্র অধিকার তাদের পিতামাতার এবং তাদের অবর্তমানে তাদের বড় ভাইদের। কোন মেয়ের পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত স্বেচ্ছায় কোথাও বিয়ের অধিকার নেই। কোন দায়িত্বের সঙ্গে কমপক্ষে তিন বার পালিয়ে যেতে সমর্থ না হলে তার উপর তার দায়িত্বের কোন অধিকার বর্তায় না; এমনকি গোপনে বিয়ে করলেও নয়।
- ৮। কোন পাত্রীর বাড়ীতে কোন পাত্রের আত্মীয়স্বজন কণ্ঠা দেখতে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয় ততক্ষণ অস্থলোকের ঐ বাড়ীতে বউ হিসেবে কন্যা দেখতে যাওয়া নিষিদ্ধ। কেউ গেলে তবে তাকে সামাজিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
- ৯। বর ও কনে ছ'পক্ষের মধ্যে বিবাহ ঠিক হয়ে যাওয়ার পর কোন পক্ষ যদি কথার মর্যাদা খেলাপ করে তবে সামাজিক বিচারে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সেক্ষেত্রে অপর পক্ষের মানহানীর জন্য তাদেরকে ব্যবতীয় ক্ষতি পূরণ দিতে হয়।
- ১০। সমাজে যে কোন ব্যক্তির অন্যকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে কাগজে কিছু (গবাল) লিখে অপপ্রচার করা অপরাধের পর্যায়ভুক্ত।

ধর্ম ও শাস্ত্র :

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রায় গ্রামে ক্যং (বা বৌদ্ধ মন্দির) আছে। সেখানে ভাস্তেরা (বৌদ্ধ ভিক্ষুরা) থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিনগুলিতে জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দেন। ভাস্তেদের জ্ঞান প্রতি

সপ্তাহে অন্ততঃ প্রত্যেক পরিবার একবার করে “শ্রং” (ভিক্ষুদের আহ্বার) “কাং”-এ দান করে । বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিন গুলিকে ভক্তি সহকারে পালন করে । এরমধ্যে ভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধের জন্ম, মৃত্যু ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি দিনটির স্মরণে চাকমারা সাড়ম্বরে “বৈশাখী পূর্ণিমা” উদযাপন করে । তা’ছাড়া মাঘী পূর্ণিমার দিনে কাং-এর প্রাক্কণে ব্যাহুচক্র রচনা করা হয় ও রাত্রে আকাশে গৌতম বুদ্ধের স্বর্গস্থিত চুলগুলির সম্মানে ফানুস উড়ানো হয় । উল্লেখিত ব্যাহুচক্র তুষার কারণে মর্ত্যালোকের বিভিন্ন জীবদের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও সংসারের বিভিন্ন মোলকধাঁধায় সংসরণের ইঙ্গিতবহ ।

সুহ্মর অতীতে চাকমারা কবে প্রথম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে তা’ সুষ্ঠু গবেষণা ব্যতীরেকে এখন বলা সম্ভব নয় । তবে মনে হয়, বহু পূর্ব থেকেই চাকমাদের উপর বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্ম উভয় ধর্মেরই প্রভাব ছিল . চাকমাদের বেশ কিছু পূজায় যেমন জাদিপূজা, ভাত-ত্যা ইত্যাদি যেমন বৌদ্ধদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমন গাওপূজা, খানমানা ইত্যাদিতে হিন্দুদের প্রভাব দেখা যায় । সে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচিত হবে ।

তৎপূর্বে চাকমাদের “লুরি” নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও তাদের “আঘরতার” নামক শাস্ত্রের আলোচনা করা যাক ।

বহু পূর্ব থেকে বর্তমান হীনযানী মতাবলম্বী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আগে চাকমা সমাজে লুরি বা রাউলী নামে যে এক শ্রেণীর বৌদ্ধ পুরোহিত ছিল, তারা আজ বিংশ শতাব্দীর শেষে লুপ্ত প্রায় অবস্থায় এসে পৌছেছে । লুরিরা তালপাতার উপর তাদের ধর্মীয় সূত্রাদি লিখে রাখতো । তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম “আঘরতার”। প্রায় ২৮টির মত “তার” রয়েছে” বলে জনশ্রুতি আছে । এগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো—

- ১। মালেন তারা, ২। সাধেংগিরি তারা, ৩। আনিজা তারা, ৪।
- লিগল মোগল তারা, ৫। দাসা পারামি তারা, ৬। ত্রিগুহুরা তারা, ৭।
- বড় কুক্ক তারা, ৮। ছোট কুক্ক তারা, ৯। আরিস্তামা তারা, ১০।

রাকেন ফুলু তারা, ১১। সাজ্জ ফুলু তারা, ১২। আরিমায়া তারা, ১৩।
জিয়ন ধারণ তারা, ১৪। আজিনা তারা, ১৫। পুহুম ফুলু তারা, ১৬।
ফুহুম ফুলু তারা, ১৭। সুভাদিবা তারা, ১৮। চেরাগ ফুলু তারা, ১৯।
সানং ফুলু তারা, ২০। বুদ্ধ ফুলু তারা, ২১। সাক সুত্তন তারা, ২২।
রাজা হোড়া তারা (লুপ্ত), ২৩। সরক দান তারা, ২৪। সবাদিবা তারা,
২৫। শাক্য তারা, ২৬। ফকিরি তারা, ২৭। আঙারা স্ত্র তারা ইত্যাদি।

উল্লেখিত “তারা” গুলি চাকমা বর্গে বিকৃত পালি ভাষায় লিখিত। প্রায় তারার শুরুতে “সি নাম তে সা ভাগাওয়াতু আরাখাতু সাহান্মা সাহান্মাতেসি তিথি” লাইনটি পাওয়া যায়। এই সমস্ত “তারা” গুলির প্যার্থোক্তার করা এখনও সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে স্বর্গীয় বিমলানন্দ ভিক্ষু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু এ প্রতিভাবান ভিক্ষু ঐগুলি গবেষণা কালে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে তৎকালীন ছারারোগ্য যক্ষারোগে অকালে পরলোক গমন করলে তাঁর অসমাপ্ত কর্ম পরবর্তীকালে কেউ আর সাফল্যের সাথে এখনও পর্যন্ত সূসম্পন্ন করতে পারেননি।

আলোচ্য ক্ষেত্রে কয়েকটি “তারা”র ব্যবহার স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষের “চাকমা জাতি” গ্রন্থ থেকে নিম্নে প্রদত্ত হলো,—

ক্রঃ	“তারা”	ব্যবহার
১।	বড় কুরুক তারা ও ছোট কুরুক তারা	বড় ধরণের বিবাহে
২।	সিগল মোগল তারা	জাদি পূজায় (ধর্ম পূজায়)
৩।	মালেম তারা, দাসা পারামি তারা ও সাহসফুলু তারা	মৃত ব্যক্তির মুখে পিণ্ডদানে
৪।	আনিজা তারা	বড় লোকের মৃত্যুতে
৫।	আরেন্তামা তারা	মৃতের নামে পিণ্ড উৎসর্গ কালে
৬।	মালেন তারা, পুহুমফুলু তারা ফুহুমফুলু তারা, ত্রীপুহুরা তারা, সুভাদিবা তারা, সাহসফুলু তারা ও দাসা পারামি তারা	শ্মশানে মৃতদেহ দাহনের সময়
৭।	রাখেমফুলু তারা	বার্ষিক প্রাধে

উল্লেখিত “ভারা” গুলি পার্শ্ববর্তী অমুঠানাদিতে লুরিদের কর্তৃক পঠিত হয়।

পূজা, পার্বণ ও উৎসব :

চাকমারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও চাকমাদের মধ্যে এমন সব কতগুলি পূজা, পার্বণ এবং উৎসব প্রচলিত রয়েছে যে গুলিকে কোন প্রকারে বৌদ্ধধর্মের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে আবার হিন্দুধর্মেরও প্রভাব দেখা যায়। নিম্নে চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত কতগুলি পূজা, পার্বণ ও উৎসবের বিবরণ দেওয়া গেল।

ক. ভাতত্যা :

পূর্ব পুরুষের আত্মার সদগতি কামনা করে এবং মৃত্যুর পর কে কোথায় কোন অবস্থায় পুনজন্ম নিলেন তা’ নির্ণয়ের জন্ত ভাত-ত্যা পূজার আয়োজন করা হয় এটি একটি গোত্রপূজা। নির্দিষ্ট এক একটি গোত্র নিজেদের পূর্ব পুরুষেরা মৃত্যুর পর কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন নির্ণয়ের জন্তই এই ভাতত্যা পূজার আয়োজন করেন। চাকমাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর নিজস্ব গোত্রের (গুণ্ডির) লোকেরা আবার নিজেদের মধ্যে পুনজন্ম গ্রহণ করেন। তবে তারা যদি ইহ জীবনে গুরুতর কোন পাপ করে থাকলে পরলোকে ভূত, প্রেত ইত্যাদি হয়ে জন্মান অথবা মর্ত্যলোকে পুনরায় মানবের প্রাণী যেমন শূকর, কুকুর ইত্যাদি হয়ে জন্মান বলে সাধারণের বিশ্বাস।

পূর্বে যে গোত্র ভাতত্যা পূজার আয়োজন করতো তারা প্রথমে প্রত্যেক পরিবার নিজেদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের সাত থেকে চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্ত নামের তালিকা প্রস্তুত করে গোত্র প্রধানের কাছে পাঠাতো। এভাবে সমস্ত তালিকাগুলি সংগ্রহের পর একদিন গোত্র প্রধান কর্তৃক নির্বাচিত কোন একটি স্থানে পূজার আয়োজন করা হতো। পূজা স্থানে প্রত্যেক মৃতের নামে তালিকা অনুযায়ী কলাপাতার উপর খাবার সাজানো হতো। এতে লুরিরা পৌরহিত্য করতেন।

পূজার ষাণ্ঠীয় আয়োজন সমাপ্ত হলে লুরিরা আখরতারা খুলে মন্ত্র পড়তে শুরু করেন। তখন অনেকে ঐ মন্ত্র শুনে মূর্ছাহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে

ক্রন্দন করতে থাকে। এই অবস্থায় পূজার আহ্বায়ক (গোত্র-প্রধান) এবং লুরি তার কাছে গিয়ে মৃতদের নামের তালিকা পড়েন। ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি কোন মৃত ব্যক্তির নাম শুনে চেতনা ফিরে পায় তবে সে পূর্বজন্মে ঐ মৃত-লোকটি ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। এরপর তার সামনে ঐ মৃতলোকটির নামে সাজানো আহার (আদারা) পরিবেশন করা হয়। সে মুমূর্ষু অবস্থায় ঐ খাবার থেকে যে খাদ্য গ্রহণ করে পূর্ব জন্মে মৃত্যুর আগে তার ঐ খাত্তের প্রতি তৃষ্ণা ছিল বলে মনে করা হয়। অনেক সময় ঐ পূজায় অনেক শূকর, কুকুর ইত্যাদি জীবজন্তু মূর্ছাহত হয়ে মারা যায়। এ দৃশ্যে উপস্থিত লোকেরা ধরে নেয় ঐ জীবজন্তুগুলি পূর্বজন্মে গোত্রের কেউ না কেউ ছিল যারা পাপের ফলে জীবজন্তু হয়ে পুনর্জন্ম নিয়েছে এবং পূজায় মন্ত্র শুনে ঐ পাপের কর্মফল থেকে এইমাত্র মুক্তি পেল। অনেক সময় পূজায় দুঃপোষ্য শিশুরাও কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা যায়। সে ক্ষেত্রে তাদেরকেও মৃতের নামের তালিকা পড়ে শোনানো হয়। ঐ সব তালিকাভুক্ত নাম শুনেও যদি শিশুটি চেতনা ফিরে না পায় তখন তাকে অন্য গোত্র থেকে এই গোত্রে জন্মেছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে তাকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বাঁশ পুঁতে ছোট্ট মাচার আকারে তোলা একটি “দানঘর”-এ তুলে মন্ত্রপাঠ করে শুনানো হয়। ঐ মন্ত্র শুনে শিশুটি তার জ্ঞান ফিরে পায়। বয়স্ক লোকদের বেলায়ও কেউ যদি মৃত লোকদের নামগুলি শুন্যার পরও জ্ঞান ফিরে না পায় তবে তাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাতগা পূজা অচল। ব্রিটিশ যুগের অবসানের সময় এ পূজা এখান থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

খ. থানমানা :

সমষ্টিগত পূজার মধ্যে থানমানা পূজা চাকমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূজা। প্রতি বছর গ্রামদেশে থানমানা পূজার আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে মিলে ঘরপিছু একটি মোরগ অথবা মুরগী এবং তৎসঙ্গে প্রয়োজন-মত চাল ও টাকা পূজায় দান করে। গ্রামের মঙ্গলের জন্য বাস্তুদেবতা থানকে পূজা দেওয়া হয়। উক্ত পূজায় সর্বমোট ১৪ জন দেবদেবীকে পূজা

দেওয়া হয়, তাঁরা হলেন—

- ১। মালক্ষীমা—ফসল ও ঐশ্বৰ্যের দেবী।
- ২। থান—বাস্তবদেবতা।
- ৩। বিয়াত্রা বৃহৎ তারা ?)—গঙ্গাপুত্র। ইনি স্বর্গ থেকে লক্ষ্মীকে মর্ত্যালোকে নিয়ে আসেন।
- ৪। গঙ্গা—নদী, সমুদ্র ও জলের দেবী।
- ৫। ধলেশ্বরী—কার্পাস-দেবী।
- ৬। পরমেশ্বরী—আত্মশক্তি (প্রকৃতি)।
- ৭। কালাইয়া—মহাকাল, মতান্তরে অনিষ্টকারী বায়ু দেবতা।
(কালাত্বেদর)
- ৮। রাখায়াল—রক্ষাকর্তা।
- ৯। ভূদরাজা—ভূতের রাজা।
- ১০। মাত্যা—বাঘের দেবতা।
- ১১। হাত্যা—অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের দেবতা।
- ১২। ফুলকমরী—খোস পাঁচড়ার দেবতা।
- ১৩। মেলকমরী—বসন্ত, ওলাউঠা ইত্যাদির দেবতা।
- ১৪। মোহিনী—দাদ, পাকুই ইত্যাদির দেবতা।



গ্রামদেশে নদীতীরে থানমানা পূজার আয়োজন করা হয়। নদীতে তিনটি বাঁশ পুঁতে সেগুলির উপর একটি ছোট্টঘর গঙ্গাদেবীর জন্ত তৈরী করা হয়, এ জন্ত এটাকে গড়াঘর বলে। তার সামনে একটি মাটির বেদী প্রস্তুত করে গঙ্গাপুত্র বিয়াত্রার আসন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নদীতীরে একটি সবুজ ডাল মাটিতে পুঁতে ভূতের রাজার জন্ত চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া নদী-তীরে কাদার উপর বাঁশ পুঁতে তাতে নকশা এঁকে এবং বেত দিয়ে ধান, তুলা প্রভৃতি ফসলের প্রতিকৃতি সাজানো হয়। মূলতঃ এই সমস্ত ফসলাদির অধিক ফলন এবং বিভিন্ন রোগব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতির কামনা করে এই সমস্ত দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়।

পূজায় গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে ছাগল মালিন্দ্রী মা বিয়াত্রা, পরমেশ্বরী, ভূদরাজার উদ্দেশ্যে শূকর অগ্ন্যাদির পুষ্ক ও স্ত্রী ভেদে মোরগ অথবা মুরগী বলি দেওয়া হয়। এরপর সবাই মিলে পূজা শেষে এসব রান্না করে তৃপ্তির সাথে খায়। অবশ্য উক্ত পূজায় বাঘের দেবতা মাত্যার উদ্দেশ্যে একটি ঝুটিওয়ালা লাল মোরগ রাখা হয়। যেট পরদিন ওঝা অরণ্যে নিয়ে গিয়ে মাত্যার উদ্দেশ্যে বলি দেয়। তা' না হলে ওঝাকে নাকি বাঘে ধরে খায় এবং গ্রামবাসীদের পক্ষে অরণ্যে যাওয়া আসা করা বিপজ্জনক

গ. ধর্মকাম :

গৃহস্থের মঙ্গল ও উন্নতির জন্ত ধর্মকাম পূজা অরণ্যে করা হয়। এতে লুরিরা পৌরহিত্য করেন। নির্দিষ্ট দিনে যে গৃহস্থ এ পূজার আয়োজন করে তাঁর স্ত্রী খুব ভোরে নদীতে গোছল করার পর বসতবাড়ী থেকে পৃথক এমন কোন বাড়ীতে পূজার উদ্দেশ্যে ভাত তরকারী রেঁধে কলাপাতায় মুড়িয়ে পূজাস্থানে নিয়ে যায়।

পূজায় কলাপাতার উপর ভাত পিরামিড আকারে সাজানো হয়। আর ভাতের পিরামিডের উপর ৬ কটি অন্নপিণ্ড বসানো হয়। এরপর ঐটির চারিপাশে ইক্ষু, কলা, মিঠা ইত্যাদি বিবিধ উপকরণ সাজানো হয়। এই সময় ভাতের পিরামিড থেকে অন্নপিণ্ডট হঠাৎ যদি ঝড়ে পড়ে তবে গৃহস্থের অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে।

অন্নপিণ্ডটি ভাতের পিরামিডের উপর ঠিকমত বসানো হলে প্রথমে গৃহকর্তা সস্ত্রীক পূজায় প্রণাম জানায়। অতপর লুরি বা “লোথক” আঘরতারা থেকে দাসা পারমি তারা পাঠ করেন। (যে সমস্ত লুরিরা সন্তানসম্বন্ধ ত্যাগ করে পুনরায় গৃহী হন তাদেরকে লোথক বলে।)

এ সময় পূজাস্থলে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। কলাপাতায় মোড়ানো ভাত থেকে বাষ্পের আকারে ধোঁয়া বেরুতে থাকে। আর সেখানে একটি মাকড়সা বন থেকে এসে আঁশ দিয়ে ভাতের মোচার (কলাপাতার মুড়া ভাতের) চারি-

দিকে জাল বুনতে থাকে। এ দৃশ্যে উপস্থিত সবাই পূজা সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেয়। পূজায় বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ১৪টি মোরগমুরগীও বলি দেওয়া হয়।

ঘ. হালপালনি ও মালশ্রীমা পূজা :

বাংলা বর্ষের আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ ফসল ও ঐশ্বর্যের দেবী মালশ্রী-মাকে একটি খালায় মুরগী, ডিম ও কাঁকড়াসহ ভাত দেওয়া হয়। ঐ ভাত তরকারি গৃহিণী তার খাবার সাথে খেলে গৃহস্থের উন্নতি হয় বলে সাধারণের বিশ্বাস। ঐদিন মালশ্রীমার সম্মানে হালের বলদগুলিকেও চাষাবাদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়; এ কারণে এই দিনটিকে হালপালনি দিনও বলা হয়। এছাড়া এই দিনটির আরও কতগুলি বিশেষ গুরুত্বের জ্ঞান চাকমারা এ দিনটিকে জলবিবুও বলে থাকে।

ঙ বিবু উৎসব :

চাকমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন “বিবু”। বাংলা বর্ষের শেষ দুই দিন “বিবু” বাংলা বর্ষের শেষ দুইদিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে চাকমারা বিবু উৎসব পালন করে। পুরাতন বর্ষের শেষ দিন মূল বিবু, তার আগের দিন ফুলবিবু এবং নববর্ষের প্রথম দিনের নাম গোজ্যাপোজ্য।

ফুলবিবু দিনে সবাই ভোরে উঠে নদীতে গিয়ে স্নান করে নদীর তীরে কলা পাতায় দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল দেয়। অনেকে আবার সেই ফুল কলাপাতায় করে ভাসিয়েও দেয়। ছেলেমেয়েরা ঐদিন দল বেঁধে খেলাধুলা করে। উপজাতীয় খেলাধুলার মধ্যে “ঘিলা” নামক এক প্রকার ফলের বীচি নিয়ে একটি বিশেষ খেলা ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়; এর নাম “ঘিলাখারা”

শিকারী ফুলবিবু দিনে মাংস সংগ্রহের আশায় শিকার করতে বেরায়। কারণ মূলবিবু দিনে চাকমারা কোন প্রাণী হত্যা করেনা। বছরের প্রথম দিন মাছ-মাংস দিয়ে ভাত খেলে সারা বছর ঐভাবে ভাল ভাল খাদ্য খাওয়া যাবে

বলে অনেকে মনে করে। এ কারণে ফুলবিবু দিনে গ্রামের অনেকে দলবদ্ধ হয়ে হৈ চৈ করতে করতে জঙ্গলে গিয়ে হরিণ, শূকর, সম্বর ইত্যাদি শিকার করে ঐগুলির মাংস আগুনের তাপে শুকিয়ে নেয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে রাখে। পরদিন বর্ষশেষে মূলবিবু। এটিই চাকমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন। ঐদিন ঘরে ঘরে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয় এবং অতিথিদের সবার গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকে। শিশুরা এই দিনটির আশায় পূর্ব থেকে নানা ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাড়ী বাড়ী গিয়ে মুরগীদেরকে খুদ (আধার) দিয়ে আসে। বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে প্রণাম জানায় এবং তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। গৃহিনীরা তাদেরকে নানান ধরনের পিঠা ও খাবার দেয়। বলা বাহুল্য ঐদিন শিশুদেরকে বিশেষ আদর জানিয়ে অনেকে ডিম সিদ্ধ করে তাদের হাতে তুলে দেয়। চাকমাদের পিঠার মধ্যে বিনিপিধা, সান্তাপিধা, কলাপিধা, বরাপিধা ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বিবুদিনে প্রত্যেক বাড়ীতে অবশ্যই পাখোন (পাচন) রান্না হয়। অনেকে মনে করে পাখোন খেলে ঐদিন পেট খারাপ হয় না।

ঐদিন ভোর থেকে তরুণীরা দল বেঁধে নদী থেকে জল তুলে গ্রামের বুড়ো-বুড়ীদেরকে স্নান করায় আর তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পালাগান “রাধামন ধনপুদি”তে পূর্বকালে বিবু দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে যুবতীদেরকে জীবনের সর্ব প্রথমবার উন্মুক্ত বক্ষে খাদি (বক্ষবন্ধনী) বাঁধতে হতো বলে জানা যায়। তৎকালে মেয়েদের বয়স ১৩ বছর পুরোলে তাকে যুবতী ধরা হতো।

যে সমস্ত বাড়ীর ছেলেরা বিবুর পূর্বে আত্মীয় স্বজন বিহীন অবস্থায় নিজেদের গ্রাম থেকে দূরদূরান্তে বিয়ে করে তাদের ঐদিন অবশ্যই সঙ্গীক বাড়ীতে ফিরে আসতে হয় এবং বিবুদিনে স্বগৃহে সঙ্গীক উপস্থিত থাকতে হয়। স্ত্রীকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে তার এই বেড়ানোকে চাকমারা বিবু-বেড়ানা বলে।

নব বর্ষের প্রথম দিনের নাম চাকমা ভাষায় গোর্জ্যাপোর্জ্যা। ঐদিন বুড়োরা মদ খেয়ে খুব ফুঁটি করে নাতি নাতনীদের বাড়ীতে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদেরকে

আশীর্বাদ বিতরণ করে। চাকমা সমাজে সচরাচর প্রত্যেকে ঐদিন নিজেদের উপরিষ্ট আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করে তাদের প্রণাম জানায় এবং তাদেরকে নিজের বাড়ীতে এনে ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ভাত তারকারি খাওয়ায়।

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ :

ক। জন্ম :—কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের সময় হলে তাকে তাঁর স্বামীর বাড়ীতে অথবা স্বামীর বংশের নিকট কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। চাকমাদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শিশুর স্বগোষ্ঠিতে জন্ম গ্রহণ করাই শ্রেয়। প্রসবের সময় প্রসূতির চারিপাশে ভারী ভারী কাপড় টাঙ্গিয়ে একটি আঁতুর ঘর করা হয়। ওখানে ধাত্রী বাদে অত্যাচারদের প্রবেশ নিষেধ। আঁতুর ঘরে কোন পুরুষকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

নির্দিষ্ট সময়ে শিশুটি হলে সঙ্গে সঙ্গে তার দীর্ঘ নাভিটি কেটে নাভীর মুখ সূতা দিয়ে বাঁধা হয় এবং নাভিটি তাড়াতাড়ি শুকানোর জন্তু তাতে মেটে সিঁদুর অথবা কাপড় পোড়া ছাই গুলে দেওয়া হয়। এরপর শিশুটিকে উষ্ণজলে স্নান করিয়ে মায়ের পাশে রেখে তার মুখে মধু মিশ্রিত পানি তুলে দিয়ে পান করানো হয়। এতে আগামীতে তার জীবন মধুময় হবে বলে বিশ্বাস।

শিশুর জন্মের পর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আঁতুর ঘরে দরজার বাইরে একটি পাত্রে তুষ দিয়ে আগুন দেওয়া হয়; কোন অপদেবতা যাতে আঁতুর ঘরে প্রবেশ করে শিশু এবং প্রসূতির ক্ষতি করতে না পারে তজ্জন্তু এ ব্যবস্থা। যে কেউ আঁতুর ঘরে প্রবেশের পূর্বে তার হাত আগুনে সেকা অবশ্য করণীয় বিষয়। এটি চাকমাদের একটি রীতি।

এক সপ্তাহ অন্তে শিশুটির নাভি শুকিয়ে যাবার পর ধাত্রী ঘিলাকুঁচ (ঘিলাকজই) পানিতে সোনারূপা ভুবিয়ে ঐ পানি শিশুটি এবং তার মায়ের শিরে ছিটিয়ে তাদেরকে পবিত্র করে। সে বাড়ীর অত্যাচার সদস্যদেরকেও ঐ ভাবে পবিত্র করে। তারপর আনুষ্ঠানিক ভাবে সে শিশুটিকে সবার সামনে তার মায়ের হাতে তুলে দেয়। এরপর শিশুরটির মা তাকে একটি ভোজে আপ্যায়ন করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় করে।

দিন কিছু পর নাপিত ডেকে শিশুটির চুল মুড়িয়ে দেয়া হয়। গর্ভ থেকে নিয়ে আসা এই চুলকে চাকমারা “বিষচুল” বলে। ঐ চুল না মুড়ানোর আগ পর্যন্ত শিশুটি ও তার মা অগ্ন্য লোকের বাড়ীতে যাওয়া নিষিদ্ধ। তার মা অন্য কারোর বাড়ীতে বেড়াতে যেতে চাইলেও তাকে কেউ বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেবে না। এ বিষয়ে চাকমাদের সংস্কার হলো. বিষচুল নিয়ে কোন স্ত্রীলোক পরের বাড়ীতে গেলে ঐ বাড়ীর কতি হয়।

শিশুর জন্মের পর থেকে ঘিলাকুঁচ পানি দিয়ে পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত শিশুটির মায়ের রান্নাঘরের হাঁড়ি পাতিল ধরাও নিষিদ্ধ। তাকে ঐ সময় অন্যেরা ভাত তরকারি রেঁধে খাওয়ায়। দিনকিছু পরে তার অন্যান্য আত্মীয়া এবং প্রতিবেশীরা তাকে টিফিন ক্যারিয়ার অথবা কলাপাতায় মুড়িয়ে ভাত তরকারী সরবরাহ করে। চাকমা সমাজে এর নাম “ভাতমজা” দেওয়া। এতে শিশুর মায়ের স্বাস্থ্য অটুট থাকে এবং শরীরে বলের সঞ্চার হয়।

খ। মৃত্যু :-কোন লোকের মৃত্যু হলে তার মরদেহ শুভ্র কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। ঐ সময় ঢোলে বিশেষ জাতীয় সংকেত (তাল) বাজানো হয়। ঐ সংকেত (ঢোলের শব্দ) শুনে পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারে কোন বাড়ীতে লোক মারা গেছে। তখন গৃহস্থেরা ঐ বাড়ীতে খবর নিতে যায়। এবং গৃহিনীরা গৃহের সদর দরজায় ভাঙ্গা হাঁড়ি পাতিল অথবা বাসনে তুষ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। এটি সম্ভবতঃ কোন অপদেবতা বা ভূত-প্রেত যাতে ঐ গৃহে কোন উপদ্রব করতে না পারে তজ্জগু করা হয়।

শবদাহের দিন মৃত লোকটির দেহ স্নান করানো হয়। ঐ সময় বৌদ্ধ ভিক্ষু ডেকে মৃতের আত্মীয় স্বজন মঙ্গলমুত্র পাঠের ব্যবস্থা করে। অথবা লুরি ডেকে “জয়মঙ্গল তারা” “মালেন তারা” ইত্যাদি “আঘর তারা” নামক ধর্মীয় গ্রন্থাদি থেকে বিভিন্ন “তারা” পাঠ করানো হয়। এরপর মৃতের আত্মীয় স্বজনেরা তার আত্মার সদগতি কামনা করে তার বৃকে টাকা পয়সা প্রভৃতি দান করে। এই দানের টাকা তার পরলোকে স্বর্গযাত্রার কালে নদী পার হওয়ার জগু নৌকা ভাড়া বাবদ বা অগ্ন্যগ্ন্য কাজে লাগতে পারে বলে সাধারণের বিশ্বাস।

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃতের মুখে সাতবার সাতটি অন্নপিণ্ড স্পর্শ করানোর পর ঐগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। অতঃপর তার পায়ের একটি কনিষ্ঠ আঙ্গুলে সাত লহর বিশিষ্ট সূতার একপ্রান্ত বেঁধে ঐটির অপর প্রান্ত একটি বাচ্চা মোরগের আঙ্গুলে বাঁধা হয়। এরপর মৃতের আত্মীয়-স্বজন ঐ বাচ্চা মোরগটিকে চেপে ধরে রাখে। গ্রামের একজন প্রবীণ ব্যক্তি উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করেন, ‘মরায় জেদায় ফারুক গরি দিবার হুকুম আঘেনি?’ (মৃত ও জীবিতদের মধ্যে সম্বন্ধ ছিন্নের হুকুম আছে কি?)। উপস্থিত সবাই, ‘আঘে আঘে’ মানে ‘আছে আছে’ বলে। তখন দা দিয়ে কুপিয়ে সূতাটি ছিন্ন করা হয়। একে মৃত ও জীবিতদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্নের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এরপর লুরিরা আঘরতারা থেকে ‘আনিজাতারা’ পাঠ করেন।

শবটিকে বাঁশ নির্মিত একটি বাহনে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐটির নাম ‘আলং’। মৃতদেহটি বাড়ী থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃতের পাগুলি তার বাড়ীর দিকে থাকে। এটি তার বাড়ী থেকে শেষ যাত্রার প্রতীক। সাথে সাথে ঐ বাড়ীর যাবতীয় পানিও উত্তনের ছাই বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এটিও মৃতের সাথে ঐ বাড়ীর সম্পর্ক ছিন্নের প্রতীক।

শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃতদেহটির সাথে একটি পুটলীতে তার জন্ম ভাত ও অন্নাত্ন খাদ্য থাকে। ঐগুলি মৃতদেহ দাহ করার আগে শেষ বারের মত তার মুখে স্পর্শ করানো হয়। এরপর মৃতদেহটি ‘আলং’সহ চিতার চারিদিকে পুরুষ হলে পাঁচবার ও স্ত্রীলোক হলে সাতবার ঘুরানোর সময় প্রত্যেকবারে একবার করে চিতার সাথে ঐটিকে সামান্য একটু ধাক্কা দিয়ে সাতবারের পর চিতায় তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য মৃতদেহটি পুরুষ হলে চিতায় পাঁচস্তর এবং স্ত্রীলোক হলে সাতস্তর লাগু থাকে।

এরপর মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র অথবা রক্ত সম্পর্কের নিকটস্থ কোন আত্মীয় প্রথম তার মুখাগ্নি করে এবং তৎপরে চিতায় অগ্নি সংযোগ করে। তারপরে অন্নাত্নরা একে একে চিতায় আগুন দেয়। মৃতদেহটি পুড়ে গেলে উপস্থিত সবাই নদীতে

গিয়ে কাপড়-চোপড়সহ স্নান সমাপন করে বাড়ী ফিরে চলে যায়। এই স্নান আপদ বিপদ দূর করে দেহকে পবিত্র করার জ্ঞান করা হয়।

পরদিন তার স্বগোত্রের কোন একজন আত্মীয় শ্মশানে গিয়ে তার হাড়গুলি থেকে কিছু হাড়সহ সামান্য ভস্মবিশিষ্ট ছাই একটি নূতন পাতিলে নিয়ে পাতিলটির মুখ সাদা কাপড়ে ঢেকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। একে হাড় ভাসানো বলে।

এরপর ঐ চিতায় চারটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের মাথাগুলিতে একটি সাদা চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। ঐ চাঁদোয়া চিতায় ছায়া দান করে। ঐ চিতায় আরও কিছু বাঁশ পুঁতে ঐগুলির মাথায় সাদা কাপড় (তাংগোন) উড়িয়ে দেওয়া হয়।

যদি মৃতলোকটি কলেরা, বসন্ত, যক্ষা, কুষ্ঠ প্রভৃতি ছুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যায় তবে অগ্ন্যস্ত্র লোকদের নিরাপত্তার জ্ঞান তাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এছাড়া যে সমস্ত শিশুদের দাঁত উঠেনা তাদেরকেও মাটি চাপা দেওয়া হয়। ২। ৩ মাস পরে মৃতদেহ মাটি থেকে তুলে পুনরায় যথারীতি দাহ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, চাকমারা কখনও বুধবারে মৃতদেহ দাহ করে না। ঐ বারটিকে চাকমারা “লক্ষ্মীবার” মনে করে। ঐ বারে (বুধবারে) ফসল ও ঐশ্বৰ্যের দেবী মালক্ষ্মীমা স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে এসেছিলেন বলে চাকমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে আছে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে যতদিন কোন বাড়ীতে মৃতদেহ থাকে, ততদিন ঐ বাড়ীতে উন্নত জ্বালানো হয় না। ঐ সময় ঐ বাড়ীর লোকেরা পাড়ায় অগ্ন্যস্ত্র আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে। সাতদিন পর্যন্ত তারা নিরামিষাশী থাকে।

এরপর এক সপ্তাহ গেলে ক্যং (বৌদ্ধ মন্দির) থেকে ভাস্তে (বৌদ্ধ ভিক্ষু) বাড়ীতে ফাং (আহ্বান) করে এনে বাড়ীর লোকেরা মঙ্গলমূত্র গুনে এবং মৃতের নামে পিণ্ডদান ও অন্যান্য দান দক্ষিণা করে। তারা বছর গেলে

পুনরায় মৃতের নামে আবারও দানদক্ষিণা করে। একে চাকমা সমাজে “বঝরি” দেওয়া বলে।

৭। বিবাহ :—চাকমাদের বিয়েতে রীতিনীতি এবং আনুষ্ঠানিকতার পরিমাণ যথেষ্ট। পূর্বে চাকমা সমাজে বিয়ের ব্যাপারে অনেক রীতিনীতি অনুসরণ করা হতো যা বর্তমানে গ্রামদেশে দেখা গেলেও নব্য শিক্ষিত চাকমা সমাজে কিছুটা লোপ পেয়েছে; তবু এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত রীতিনীতি এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হচ্ছে তা’ এক কথায় বিস্তর। নিম্নে সংক্ষেপে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হবে। তৎপূর্বে বিবাহ সম্পর্কিত আরও কতগুলি বিষয়ের আলোচনা করতে হয়।

প্রথমে আসে সম্পর্কের কথা, বর ও কনের মধ্যে কোন কোন সম্পর্ক থাকলে তাদের বিয়ে হতে পারে সে সম্পর্কে নিম্নে কিছু তথ্য প্রদত্ত হলো—

- ১। বর ও কনের মধ্যে আত্মীয়তা যদি সম (equal generation) সম্পর্কের হয়, যেমন কনে বরের মামাতো, মাসভূতো, জ্যেষ্ঠভূতো বা সেই ধরনের কোন আত্মীয় সম্পর্কের হয়, তবে তাদের বিয়ে হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য চাকমা সমাজে চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।
- ২। নিঃসম্পর্কীয় যে কোন দু’জন যুবক যুবতীর মধ্যে বিয়ে হতে পারে।
- ৩। বর ও কনের সম্পর্ক যদি দূর সম্পর্কের নানা-নাতনী, অথবা উন্টোভাবে নাতি-নানি ইত্যাদি হয়, তবে তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে।
- ৪। চাকমা সমাজে অসম (un-equal generation) সম্পর্কের মধ্যে যেমন, মামা-ভাগ্নী, চাচা-ভাতিঝি, ফুফু-ভাইপো, খালা-বোনপো ইত্যাদিতে কোন অবস্থায় বিয়ে হতে পারে না।
- ৫। স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় অথবা মৃত্যুর পরেও তার বড় বোনকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

এ গেল পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে সম্পর্ক বিচারের কথা। এবার যোগ্যতার কথায় আসা যাক। পূর্বে আধুনিক শিক্ষার আগে চাকমা সমাজে উপযুক্ত বর হিসেবে পাত্রের বংশ মর্যাদা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতাকে প্রধান যোগ্যতা হিসেবে সর্বাত্মক গুরুত্ব দেওয়া হতো। বর্তমানে অবশ্য তদন্তুলে পাত্রের শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতাকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে নিয়ে কিছু বিবরণ দেওয়া গেল :—

১. চাকমাদের রীতি অনুযায়ী পাত্রের অভিভাবককে পাত্রীর পিতা-মাতার কাছে কমপক্ষে তিনবার যেতে হয়। প্রতিবারই পাত্রের অভিভাবকেরা পাত্রীর বাড়ীতে যাওয়ার সময় নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, পিঠা ও উপহার সামগ্রী নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য শেষবারেই অধিক উপহার সামগ্রী থাকে এবং তৎসঙ্গে অবশ্যই একটি পাত্রে অথবা বোতলে মদ নিয়ে যাওয়া হয়। এই মদ পাত্রের অভিভাবককে পাত্রীর অভিভাবকের হাতে তুলে দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম মদ “মদপিলাং”। পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক ঐ “মদপিলাং” গ্রহণ করলে বিবাহে তাঁর সম্মতি প্রকাশ পায়। তখন বিবাহের দিন ধার্য করা হয়।

২. নির্দিষ্ট দিনে বরযাত্রীরা শুভক্ষণ দেখে কনের বাড়ীতে রওনা হয়। বরযাত্রীদের দলে কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকসহ বেশ কিছু সংখ্যক যুবতী থাকে। উল্লেখ্য ঐ দলে কোন বিধবা অথবা বক্ষ্যা-স্ত্রীলোককে সাথে নেওয়া হয় না। বউকে চলতে ফিরতে অথবা অস্বাস্থ্য কাজে সাহায্য করার জ্ঞাত বরযাত্রীদের মধ্যে একজন সধবা স্ত্রীলোক থাকে। তাকে “বউ ধরনী” বলা হয়। গ্রামদেশে বরযাত্রীরা একটি ফুলবারেঙ-এ (ঝুড়িতে) করে বউ সাজানোর জ্ঞাত কাপড় চোপড় ও অলঙ্কার নিয়ে যায়। শহরে ফুলবারেঙ-এর স্থলে বর্তমানে স্যুটকেস ব্যবহার করা হয়। এটি (ফুলবারেং) বরের ছোট বোন সম্পর্কীয়া কোন একজন আত্মীয়্য বহন করে। তাকে “ফুলবারেং বুননী” বলা হয়। বউয়ের পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে পিনোন, খাদি, শাড়ী, ব্লাউজ যাই নেওয়া

হোক না কেন ঐগুলি জোড় সংখ্যা হতে হয়। কেবল “সাজ্ কাপড়” হিসেবে যে আলোয়ান অথবা চাদর দেওয়া হয় ঐটি একটি হলেও চলে। গ্রামদেশে অলঙ্কারাদির মধ্যে গলায় হাবুলি, কানে খুঁতুলি, হাতে হাতীর দাঁতের বাঙোরি (চুড়ি), রূপার তৈরী কুজি খারু, পায়ে মল, বাহতে তাজুর, চুলে রূপার তৈরী চুলকাঁটা থাকে। আর শহরাঞ্চলের বিয়েতে সচরাচর বউকে গলায় সোনার তৈরী নেকলেশ, হাতে চুড়ি, কানে সোনার ছল ইত্যাদি দিতে হয়।

৩. শুভযাত্রার প্রাকালে বরযাত্রীদের সবাইকে বরের বাড়ীতে হুঁমুঠো অন্ন খেতে হয়। তারপর সবাই সারিবদ্ধ ভাবে বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে রওনা হয়। মাঝপথ থেকে কাউকে ঐদলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়না।
৪. এরপর বরযাত্রীরা কনের বাড়ীতে পৌঁছলে সেখানে তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। কনের বাড়ীর লোকেরা তাদেরকে নানাভাবে আপ্যায়িত করে। তাদের সম্মানে সেখানে ভোজ দেওয়া হয়। তারা খাওয়াদাওয়ার পর বউ সাজাতে ব্যস্ত হয়। এই সময় মেয়েকে শৈশব থেকে আপন দুধ পান করানোর জন্য বরযাত্রীদের দলপতি কনের মায়ের হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সামান্য কিছু (৫/১০) টাকা দেয়। একে “দাভা-টেঙা” (পণের টাকা) বলে। বউ সাজানোর সময় রীতি অনুযায়ী বউকে একসঙ্গে এক জোড় পিনন পরতে হয়। ভবিষ্যতে সে আর কখনও ঐ ভাবে জোড় পিনন পরে না।
৫. বউ সাজানোর পর একটি থালায় বীজযুক্ত তুলাসহ কিছু চাল নিয়ে আসা হয়। কনের পিতামাতা ও উপরিস্থ আত্মীয়েরা কনেকে বিদায় কালে ঐ থালা থেকে সামান্য পরিমাণ তুলাসহ কিছু চাল নিয়ে তাতে নামমাত্র খুঁতু ছিটিয়ে কনের মাথায় স্পর্শ করিয়ে আশীর্বাদ প্রদান করে। বীজযুক্ত তুলা এবং চাল দীর্ঘ জীবন ও সম্বলতার প্রতীক। আর তুলার বীজ বংশবৃদ্ধির পরিচায়ক।

৬. আশীর্বাদ প্রদান শেষ হলে বরযাত্রীরা বউ নিয়ে বরের বাড়ীতে রওনা হয়। ঐ সময় ঐ দলে ছায়লা বা ছায়লীও থাকে। পথে বরযাত্রীদের পারতপক্ষে কোথাও কোন বাড়ীতে উঠা নিষেধ। অনেক সময় মাঝপথে কোন গ্রাম পড়লে ঐ গ্রামের যুবকেরা মাঝপথে বড় বড় বাঁশ ফেলে বরযাত্রীদের পথরুদ্ধ করে। তখন দলপতি ঐ যুবকদের কাছে মাফ চেয়ে তাদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে রেহাই পাওয়ার আবেদন জানায়। যুবকেরা বেশ কিছু রঙ্গ করার পর তাদের ছেড়ে দেয়। তখন তারা আবার বউ নিয়ে রওনা হয়।

৭. এদিকে বরের বাড়ীতে ভোর না হতেই সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ঐদিন ভোরে ছয়জন যুবতীসহ একজন সধবা মহিলা জল আনতে নদীতে যায়। তাদের মধ্যে একজন ছ'টুকরো কলাপাতায় ফুল নিয়ে যায়। পরে ঐ ফুল নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অল্প একজন ছ'টি মাটির তৈরী ঢাকনার উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে যায়। স্নানের সময় ঐ সধবা মহিলাটি ছ'টুকরো কলাপাতায় পান-সুপারী রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ঐ সময় পান সুপারীসহ কলাপাতা ছ'টি যদি একত্রে ভাসতে থাকে তবে আগামীতে ভাবী সম্পত্তির জীবন সুখকর এবং তাদের মধ্যে মনোমিলন হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। এরপর যুবতীরা জল নিয়ে বরের বাড়ীতে ফিরে গেলে দুজন যুবতী ঐ সময় সদর দরজার ছ'পাশে ছ'টি জলপূর্ণ কলসী স্থাপন করে। ঐ কলসী ছ'টির উপর মাটির ঢাকনাসহ পূর্বোক্ত প্রদীপগুলি ঐ সধবা মহিলাটি স্থাপন করে। এভাবে নদী থেকে ভোরে পানি আনার নাম “আগ পানিকুম তুলানা”। কলসী ছ'টির পাশে ছ'টি কলাগাছও পুঁতা হয় এবং ছ'টি কলসীর গলাকে সাতলহর যুক্ত সূতা পেঁচিয়ে যুক্ত করা হয়। ঐ সাতলহর বিশিষ্ট সূতাকে “সাত-নালি সূতা” বলে। বউকে বাড়ীতে তোলার পর ঐ “সাতনালি” সূতা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এটি বউয়ের সাথে তার গোত্রের সাত পুরুষ ধরে প্রচলিত সম্পর্ক ছিন্নের প্রতীক।

৮. বউকে বাড়ীতে তোলার ব্যাপারে চাকমাদের কতগুলি রীতি আছে।

প্রথমে সদর দরজার সামনে বউ নিয়ে বরযাত্রীরা উপস্থিত হলে বরের একজন কনিষ্ঠ ভাই অথবা বোন এসে বউয়ের পা ধুয়ে দেয়। তারপর বরের মা এসে বউয়ের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে একটি সূতা বাঁধেন। সূতার অপর প্রান্ত শাশুড়ীর হাতে থাকে। তিনি বউয়ের আগে আগে বাড়ীতে ঢুকেন, তৎপরে বউ তাঁর পিছনে পিছনে বাড়ীতে ঢুকে। সাথে সাথে তাকে নিদিষ্ট একটি কামরায় (ফুলঘর-এ) নিয়ে যাওয়া হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত বউ ওখানেই থাকে।

৯. শুভলগ্ন উপস্থিত হলে বর ও কনেকে একটি বড় কামরায় পাশাপাশি বসানো হয়। কনে বরের বাম পাশে বসে। এরপর ছায়লা অথবা ছায়লী একজন এসে একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র দিয়ে সমবেত দর্শকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, “জড়া বানি দিবার হুগুম আঘেনি নেই?” (অর্থাৎ জোড়া বেঁধে দেওয়ার হুকুম আছে কি নেই?) সমবেত সবাই “আঘে আঘে” মানে “আছে আছে” বললে তখন সে (ছায়লা বা ছায়লী) বর ও কনের কোমর পেঁচিয়ে ঐ বস্ত্র দিয়ে তাদেরকে যুক্ত করে। এর নাম “জড়া বানি দেনা” অর্থাৎ জোড় বেঁধে দেওয়া। এই অনুষ্ঠানে জোড়া বেঁধে দেওয়ার পূর্বে উপস্থিত দর্শকদের কাছে ছায়লার অনুমতি প্রার্থনা করার কারণ হলো ঐ বিবাহ-সম্পর্ক সব দিক থেকে বৈধ কিনা।

১০. জোড় বেঁধে দেওয়ার পর আসে “চুঙুলাও পূজা” অনুষ্ঠান। নব-দম্পতিকে সমাজে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে অবশ্যই চুঙুলাও পূজা অনুষ্ঠান সারতে হয়। এখানে গ্রাম্য ওবা পৌরহিত্য করেন। পূজায় একটি শুকর, তিনটি মোরগ মুরগী, একটি ডিম, কিছু ধান কিছু থৈ ও একপাত্র মদের প্রয়োজন হয়। আর অবশ্যই ভাবী বউকে স্বহস্তে নদীতে গিয়ে এক পাত্র জল ঐ পূজার জন্তু নিয়ে আসতে হয়। পূজায় দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত শুকর, মোরগ (১টি) ও মুরগী (২টি) কে বলি দেওয়া হয়। এরপর প্রথমে নব-দম্পতি ও তৎপরে বাড়ীর অগ্রাণ্ড লোকেরা পূজায় প্রণাম জানায়।

১১. চুঙুলাঙ পূজা অনুষ্ঠান চুকে গেলে নব দম্পতি উপস্থিত উপরিস্থ সবাইকে প্রণাম জানিয়ে তাদের আগামী দাম্পত্য জীবনের জ্ঞাত আশীর্বাদ কামনা করে। তখন সবাই ধীজগুঙ তুলা ও চাল দিয়ে ষথারীতি তাদেরকে আশীর্বাদ করে।
- ১২ এরপর গুরু হয় খানাপিনা এবং আনন্দের পালা। তবে বিয়ের লগ্ন দেৱী হলে বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার আগেও বিয়ের খানা দেওয়া হয়। এতে গৃহস্থ এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের আনন্দের কোন তারতম্য হয়না। বিয়ের তিন দিন পর জামাতা বউকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে শশুর বাড়ীতে যায়। একে চাকমা সমাজে “বিম্বু ভাঙানা” বলে। এটি একটি অবশ্যই করণীয় রীতি। যদি কেউ নিজের বাড়ীতে বিয়ে না করে শশুর বাড়ীতে বিয়ে করে তবে তাকে সস্ত্রীক বাপের বাড়ীতে ঐ বর্ষের বিবুর আগে যেতে হয়। এই বেড়ানোকে চাকমারা “বিম্বু বেড়ানা” বলে। সেক্ষেত্রে জামাই ও বউকে শশুর বাড়ীর কাছে পিছে কোন একটি সবুজ ডালপালা যুক্ত গাছের নীচে গিয়ে উপস্থিত লোকদেরকে একটি খানা দিয়ে “বিম্বু ভাঙানা” অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়।

বিবিধ :

গৃহ ও বাসস্থান :

চাকমারা গৃহকে ‘ঘর’ এবং গ্রামকে ‘আদাম’ বলে। সচরাচর ছোট ছোট নদীর তীরে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর খোলামেলা জায়গায় চাকমাদের গ্রাম-গুলি হয়ে থাকে। শক্ত গাছের খুঁটির উপর চাকমারা যে ঘর বাঁধে তার নাম ‘মজাঘর’ (মাচাঘর)। মজাঘরের সামনে জলের পাত্র রাখার জ্ঞাত একটি খোলা মাচা থাকে। তার নাম ‘ইজর’। ইজরে উঠার জ্ঞাত একটি গাছের সিঁড়ি থাকে। এর নাম ‘সাঙু’। ইজরের পর মূলঘর। ইজর থেকে মূলঘরে প্রবেশের পর প্রথম যে অংশটি পড়ে তার নাম ‘চানা’। কামরাকে চাকমা ভাষায় ‘গুধি’ বলে। এক একটি মজাঘরে ৪/৫টি গুধি থাকে। ঘরের পিছনের কামরাকে ‘ওজ্জেলং’ বলা হয়।

পোশাক পরিচ্ছদ :

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় সকল উপজাতির রঙ-বেরঙের নিজস্ব পোশাক রয়েছে। তারা নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ নিজেরাই কোমর তাঁত (বেন) দিয়ে তৈরী করে।

চাকমা মেয়েদের নিম্নাঙ্গে পরনের কাপড়ের নাম “পিনোন” এবং বক্ষবন্ধনীর নাম “খাদি”। জুমচাষের সময় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই নিজস্ব তৈরী এক জাতীয় জামা গায়ে দেয় যার নাম ‘কবোই’। সাধারণতঃ পুরুষদের জামাকে চাকমারা “সুলুম”, পাগড়ীকে “খবঃ” বলে। চাকমাদের তঞ্চঙ্গ্যা দলের মেয়েরা কোমরে একটি কাপড় বন্ধনী (কোমর-বন্ধনী) হিসেবে ব্যবহার করে।

কুটির শিল্প :

চাকমারা বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি, ফাঁদ, পাখা, চিক্রনি, বাঁশী এবং বাতায়ন্ত্র তৈরী করে। চাকমাদের বিভিন্ন ঝুড়ির মধ্যে ‘ফুলবারে’ দেখতে খুবই সুন্দর ঝুড়ি। আর ফাঁদের মধ্যে ‘কাবুক’ এর নাম উল্লেখযোগ্য। কাবুক দিয়ে বাঘ মারা হয়।

বয়ন করাকে চাকমা ভাষায় ‘বেন-বুনা’ বলে। আর তাই কোমর তাঁতের নাম চাকমা ভাষায় ‘বেন’। জুমে তুলা উৎপন্ন হয়। ঐ তুলা থেকে চর্কা কেটে সুতা, আর ঐ সুতা বিভিন্ন রঙে রাঙানোর পর তা’ দিয়ে ‘বেন’ বুনে কাপড় তৈরী করা হয়।

মেয়েদের বিভিন্ন ডিজাইন শিক্কা দেওয়ার জন্য চাকমাদের বিশেষ ধরনের ডিজাইন-ক্লথ (নকশাযুক্ত কাপড়) রয়েছে। এর নাম ‘আলাম’। আলামে বিভিন্ন ধরনের ফুল, বৃক্ষ এবং জীবজন্তুর চোখ, পদচিহ্ন ইত্যাদির নকশা রয়েছে।

চাকমা মহিলাদের তৈরী বিভিন্ন কাপড়ের মধ্যে ‘ফুলখাদি’ ও নানা ধরনের ওড়না দেশী ও বিদেশী সকল লোকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

চাকমারা বাতায়ন্ত্রের মধ্যে বেহালা, বাঁশী, ধুতুক, খেংগরং ও ঢোল প্রস্তুত করে।

খাত্তাভ্যাস :

চাকমাদের প্রধান খাত্তা ভাত । তারা ভাতের সাথে প্রচুর পরিমাণে মাছ, মাংস এবং শাকসবজী খেতে ভালবাসে । খাত্তের মধ্যে মুরগী, শূকর, কাঁকড়া ব্যাঙ, হরিণের মাংস এবং বাঁশ কোড়লের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । বাঁশকোড়ল দিয়ে চাকমা মেয়েরা বেশ কয়েক ধরনের রান্না ও ভাজি করে । এটি চাকমাদের একটি খুবই প্রিয় খাত্তা । চাকমারা বাঙ্গালীদের চেয়ে শাক ও মরিচ বেশী খায় এবং শুঁটকীর তরকারী খেতে ভালবাসে । গ্রামাঞ্চলে চাকমাদের রান্নায় তৈল এবং শুকনো মশলার ব্যবহার কম হয় । জুমে উৎপন্ন-জাত ফুঝি, সাবারাং, বাগোর প্রভৃতি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ চাকমারা কাঁচা মশলা হিসেবে তরকারীতে ব্যবহার করে । ঐগুলি ব্যবহার করলে তরকারী সুগন্ধ-যুক্ত ও সুস্বাদু হয় । চাকমাদের রান্নাবান্না খুবই ছিমছাম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে ।

খেলাধুলা :

চাকমারা খেলাধুলার মধ্যে হা-ডু-ডু, কুস্তি এবং ঘিলাখারা খেলতে ভালবাসে । হা-ডু-ডুর নাম চাকমা ভাষায় ‘গুড়ুখারা’ এবং কুস্তিকে চাকমা ভাষায় ‘বলি-খারা’ বলা হয় । গ্রামাঞ্চলে ‘ঘিলা’ নামে একজাতীয় বীচি দিয়ে ‘ঘিলাখারা’ খেলা হয় । মেয়েরা ‘বউচি’ খেলতে ভালবাসে । বউচি খেলার নাম চাকমা ভাষায় ‘পোস্তিখারা’ ।

স্বভাব-চরিত্র :

চাকমারা ব্যক্তিগত জীবনে সরল, সত্যবাদী, শান্তিপ্রিয়, কর্মঠ, অতিথি পরায়ণ, বিত্তাহরগামী এবং স্বাধীনচেতা ; তবে অসহিষ্ণু, অমিতব্যয়ী, অসঙ্কল্পী এবং কিছুটা অদূরদর্শী । চাকমাদের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূত-পূর্ব ইংরেজ সুপারিন্টেন্ডেন্ট R. H. Sneyd Hutchinson ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত **An Account of the Chittagong Hill Tracts** নামক

গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখেছেন, “The Chakma is of medium stature and thick-set build, with a fair complexion and a cheerful and honest looking face. His features are not as pronouncedly Mongolian as those of the rest of the dwellers in the Hill Tracts. Physically he is a finer specimen of manhood than the Magh. He possesses none of the hereditary laziness of the latter, and although his independence will prevent him working as a menial for others, yet he works exceedingly hard to further his own interests. He possesses a retentive memory, grasps detail easily, and is quick to appreciate the advantages and the comforts that can be secured by industry.

..... The higher class Chakma is decidedly an intellectual man of thrifty habits. He is also a good manager.

... .. As a tribe they are stolid, argumentative and stubborn, but truthful.”

Hutchinson সাহেব বাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় মিঃ এস. সি. ঘোষ অথবা অত্র একজন জেলা প্রশাসক নাকি চাকমা অফিসারদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, “চাকমারা অফিসার হিসেবে খুব ভাল। কিন্তু কখনও তাদেরকে ভুলেও নগদ অর্থ নাড়াচাড়া করতে দিতে নেই।”

চাকমাদের নিজেদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে, “কুয়া কুরি মাত্তর পানি থানা” কথাটার অর্থ “কুপ খনন মাত্র জলপান করা”। আলোচ্য প্রবাদটিতে যে কোন কর্মে ধৈর্যহীনতা ও দ্রুত ফলপ্রাপ্তির মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে।

ভাষা ও সাহিত্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক হলেও চাকমাদের ভাষা হিন্দ-অর্য (Indo-Aryan) ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন পণ্ডিত চাকমাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। চাকমা ভাষার সাথে পালি, প্রাকৃত প্রভৃতির যোগাযোগ আছে। প্রাচীন বাংলার (“শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন” আমলের) সাথে চাকমা ভাষার ব্যাকরণগত এবং অহরমীয়ার সাথে চাকমাদের উচ্চারণের বেলায় কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হয়। তবে মণিপুর এবং শ্রীহট্টের বিষ্ণুপ্রিয়া বা ময়্যাং ভাষাভাষীদের সাথে চাকমাদের ভাষার ক্রিয়া-পদের যথেষ্ট মিল আছে। এ বিষয়টি আমি ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়কে পত্রযোগে জানালে তিনি ঐ বৎসরই আমাকে “Chakma and Bishnupuriya of Eastern Magadhi” শিরোনামে Asiatic Society-এর জার্নালে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু হঠাৎগ্যবশতঃ ঐ পত্রের উত্তর দেওয়ার অল্পকাল পরে তিনি পরলোক গমন করেন। ফলে আমার পক্ষে তাঁর মত মহান মনিষীর উপদেশের অভাবে ঐ প্রবন্ধটি আর লেখা হয়ে উঠেনি। কারণ তাঁর মত বিশাল ব্যক্তিত্বের অভাবে তখন আমার হৃদয়ে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা’ ভাষায় অবর্ণনীয়। রাজ্যমাটির মত শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে অনুন্নত এলাকার একজন তরুণ উপজাতীয় গবেষককে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শনের জন্য তখন আর কেউ ছিল না।

চাকমা ভাষা সম্পর্কে প্রথম যিনি তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি হলেন বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Dr. G. A. Grierson. তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ

“Linguistic Survey of India” নামক গ্রন্থে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে চাকমা ভাষা সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন এবং সেই সাথে তাঁর ব্যক্তিগত মতও প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর তথ্য সংগ্রহে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে। যেমন তিনি বচন ও পুরুষ ভেদে চাকমাতে ক্রিয়াপদে ধাতুর সাথে যে ধরনের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়, তা’ লক্ষ্য করেননি। তাঁর সংগ্রহে তাই চাকমাদের ক্রিয়াপদের যে নমুনা তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে ভুল রয়ে গেছে। ডঃ গ্রীয়াস’ন চাকমাদের হ’্যাবোধক বাক্যের সাথে প্রশ্নবোধক বাক্য একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। এতে তিনি চাকমাদের প্রশ্নবোধক বাক্যের সঠিক নমুনা সংগ্রহে ব্যর্থ হন। এটি অবশ্য তাঁর দোষ নয়, তাঁকে যিনি (শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান) ঐ সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেন ঐগুলিতে ভুল ছিল।

তবে ডঃ গ্রীয়াস’ন তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে চাকমা বর্ণগুলি সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য দেন, তা’ সত্যিই মূল্যবান। ঐগুলি যথাস্থানে এ গ্রন্থে ব্যক্ত করা হবে।

ডঃ গ্রীয়াস’নের পরে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত *The Origin and Development of the Bengali Language (O.D.B.L.)* নামক গ্রন্থে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে চাকমা ভাষার কতগুলি প্রত্যয় সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তবে তিনি চাকমা ভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করেননি।

আলোচ্য অধ্যায়ে চাকমা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কীয় সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে। তবে তার আগে এটি বলে রাখা দরকার যে চাকমাদের ব্যাকরণ ও শব্দকোষের সাথে বাংলা, অহমীয়া প্রভৃতি হিন্দ-আর্য ভাষাগুলির কিছু কিছু মিল থাকলেও ধ্বনি-প্রকরণের বেলায় এত বেশী অমিল যে এক্ষেত্রে একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ।

নিম্নে চাকমা ব্যাকরণের কিছু নমুনা দেওয়া গেল,

- ১। **Indefinite article** (পদাশ্রিত নির্দেশক) : চাকমাতে পদাশ্রিত নির্দেশক হিসেবে উয়া এবং ‘আন’ (<খান?) যুক্ত হয়। তবে

প্রাণী বাচক বিশেষ্যপদের শেষে সব সময় ‘উয়া’ যুক্ত হয় ; এটি স্বরবর্ণ অন্ত্যস্থিত পদের সাথে যুক্ত হলে ‘ভুয়া’ হিসেবে উচ্চারিত হয়, আর সংখ্যাবাচক শব্দে “আন” যুক্ত হয় ; যথা—

- ক। এক + উয়া = ইক্খুয়া (একটি) খ। এক + আন = এক্খান
 দুই + উয়া = দিভা (দুইটি) দুই + আন = দিআন
 তিন + উয়া = তিন্‌নুয়া (তিনটি) তিন + আন = তিন্‌নান/তিনান
 চের + উয়া = চেরভুয়া (চারটি) চের + আন = চেরান।
 একখুয়া মানুষ = একটি মানুষ এক্খান ঘর = একখানি ঘর
 গরু = দুইটি গরু। দিআন আদাম = দুইখানি গ্রাম
- গ। মানুষ + উয়া = মানুছুয়া (মানুষটি) ঘ। ঘর + আন = ঘরান (ঘরখানি)
 মাচ + উয়া = মাছুয়া (মাছটি) আদাম + আন = আদামান
 কুহরা + উয়া = কুহরাভুয়া (মোরগটি) (গ্রামখানি)
 মিলা + উয়া = মিলাভুয়া (মেয়েটি) জুম + আন = জুমান (জুমখানি)
 কাবর + আন = কাবরান
 (কাপড়খানি)

২। বচন (Number) : চাকমাতে বহুবচনে গুন, উন, আনি, দাঘি, লক ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়। যথা—

- ক। মিলা (মেয়ে)—মিলাগুন (মেয়েরা)
 পুয়া (ছেলে)—পুয়াগুন (ছেলেরা)
 গাচ (গাছ)—গাচ্ছুন (গাছগুলি)
 কুগুর (কুকুর)—কুগুরউন (কুকুরগুলি)
- খ। ঘর (ঘর —ঘরানি (ঘরগুলি)
 জুম (জুম)—জুমানি (জুমগুলি)
 লুদি (লতা)—লুদিআনি (লতাগুলি)
 পাদা (পাতা)—পাদাআনি (পাতাগুলি)
- গ। গাভুর (যুবক)—গাভুরলক (যুবকদল)
 মিলা (মেয়ে)—মিলালক (মেয়েদল)
 ঝি (ছহিতা)—ঝিলক (ছহিতাদল)

ঘ। শোর (শুগুর)—শোর' দাঘি (শুগুর সকল)

বাবু (বাবু)—বাবু দাঘি (বাবু সকল)

দেবান (দেওয়ান)—দেবান দাঘি (দেওয়ান সকল)

* শেষোক্ত শব্দগুলি বহুবচন হলেও মূলতঃ ঐগুলি সম্মানার্থে একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

ম' শোরদাঘি এভাক (আমার শুগুর আসবেন

বাবু দাঘি এষ বাবু আসুন) ইত্যাদি।

Gender (লিঙ্গ) : চাকমাতে পুংলিঙ্গে বিশেষ্য পদের শেষে আ, যা (ya).
ধন, বানা, এবং স্ত্রীলিঙ্গে ই, নি, বি, পুদি (<বতী ?) এবং বানি যুক্ত হয়, যথা—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ক। ভুলা (বোকা)	ভুলি (বোকা মেয়ে)
চেলা	চেলি
ববা (বোবা ছেলে)	বুবি (বোবা মেয়ে)
খ। ধোপ্যা (ধোপা)	ধোবনি (ধোপার স্ত্রী)
সাপ্যা (সাহেব)	সাবনি (সাহেবান)
কার্বাজ্যা (মোড়ল)	কার্বারনি (মোড়ল গিন্নী)
গ। সনাধন (সোনারধন)	সনাবি (সোনার মেয়ে)
মনাধন (মনের ধন)	মনাবি (মনের মেয়ে)
কালাধন (কাল ছেলে)	কালাবি (কাল মেয়ে)
ঘ। হুদিবানা (স্টাইলিস্ট)	হুদিবানি (মহিলা স্টাইলিস্ট)
ঙ। চাআ (চাঁদ)	চানপুদি (চন্দ্রবতী)
ধআ (ধন)	ধনপুদি (ধনবতী)

Cases (কারক) :—চাকমাতে ৭টি কারকে নিম্নলিখিত বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হয়।

কারক	বিভক্তি	উদাহরণ	বঙ্গানুবাদ
কর্তৃ	শূন্য, এ	রামে বাজারত য়েব	(রাম বাজারে যাইবে)
কর্ম	রে	ফলনারে ডাগ	(ওমুককে ডাক)
করণ	দি/লোই	দড়িদি বান	(দড়ি দিয়ে বাঁধ)
সম্প্রদান	রে	ভাস্তেরে শ্রং ছ	(ভাস্তেকে শ্রং দিন অর্থাৎ ভিক্ষুকে আহার দিন)
অপাদান	খুন	ঘরখুন আয়	(ঘর থেকে আস)
সম্বন্ধপদ	র	রামর বই	(রামের বই)
অধিকরণ	ত	ঘরত থাক্	(ঘরে থাক্)
সম্বোধন	য়া	ও রাম্যা ইধু আয়	(হে রাম এখানে এসো)

সর্বনাম পদ :—নিম্নে কতগুলি চাকমা সর্বনাম পদের উদাহরণ এবং ঐগুলি ব্যুৎপত্তি দেওয়া গেল।

ক। মুই—আমি	খ। তুই—তুমি	গ। তে—সে
মর—আমার	তর—তোমার	তার—তাহারা
আমি—আমরা	তুমি—তোমরা/আপনি	তারা—তাহারা/ তিনি

পালি চাকমা
 ময়া > ময় > মুই (আমি)
 তয়া > তয় > তুই (তুমি)
 তেন > — > তে (সে)
 অম্‌হে > আম্‌হি > আমি (আমরা)
 তুম্‌হে > তুম্‌হি > তুমি (তোমরা) ইত্যাদি।

ধাতুরূপ ও প্রত্যয় :—চাকমাতে বচন ও পুরুষ ভেদে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন

প্রত্যয় ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। যথা—

Present Indefinite :

পুরুষ	একবচন	উদাহরণ	বঙ্গার্থ	বহুবচন	উদাহরণ	বঙ্গার্থ
উক্তম	ং	গরং	(আমি করি)	ই	গরি	(আমরা করি)
মধ্যম	চ	গরচ	(তুমি কর)	অ	গর	(তোমরা কর)
প্রথম	এ	গরে	(সে করে)	ন	গরন	(তাহারা করে)

Present Continuous :

উক্তম	ঙর	গরঙর	(আমি করিতেছি)	ইর	গরির	(আমরা করিতেছি)
মধ্যম	র	গরর	(তুমি করিতেছ)	র	গরর	(তোমরা করিতেছ)
প্রথম	এর	গরের	(সে করিতেছে)	ধন	গরধন	(তাহারা করিতেছে)

Present Perfect :

উক্তম	ইলুং	গরিলুং	(আমি করিয়াছি)	ইলং	গরিলং	(আমরা করিয়াছি)
মধ্যম	ইলে	গরিলে	(তুমি করিয়াছ)	ইলা	গরিলা	(তোমরা করিয়াছ)
প্রথম	ইল	গরিল	(সে করিয়াছে)	ইলাক	গরিলাক	(তাহারা করিয়াছে)

Past Indefinite :

উঃ	ইয়ং	গরযাং	(আমি করিলাম)	ইয়েই	গরযোই	আমরা করিলাম
		লইয়ং	(আমি লইলাম)		লইয়েই	(আমরা লইলাম)
মঃ	ইয়চ	গরযাচ	(তুমি করিলে)	ইয়	গরযা	(তোমরা করিলে)
		লইয়চ	(তুমি লইলে)		লইয়	(তোমরা লইলে)
প্রঃ	ইয়ে	গরযো	সে করিল)	ইয়ন	গরযান	(তাহারা করিল)
		লইয়ে	সে লইল)		লইয়ন	(তাহারা লইল)

Future Indefinite :

উঃ	ইম	গরিম	(আমি করিব)	ইভঃ	গরিভঃ	(আমরা করিব)
মঃ	ইভে	গরিভে	(তুমি করিবে)	ইভা	গরিভা	(তোমরা করিবে)
প্রঃ	ইভ	গরিভ	(সে করিবে)	ইভাক	গরিভাক	(তাহারা করিবে)

Past Habitual :

উঃ ইধুং গরিধুং (আমি করিতাম) ইধং গরিধং (আমরা করিতাম)
 মঃ ইধে গরিধে (তুমি করিতে) ইধা গরিধা (তোমরা করিতে)
 প্রঃ ইধ গরিধ (সে করিত) ইধাক গরিধাক (তাহারা করিত)

Past Substansial :

উঃ ইলুঙুন গরিলুঙুন (I would do) ইলঙুন গরিলঙুন (We would do)
 মঃ ইলিন গরিলিন (You would do) ইলাঘুন গরিলাঘুন (You would do)
 প্রঃ ইলুন গরিলুন (He would do) ইলাক্থুন গরিলাক্থুন (They would do)

নিম্নে কয়েকটি চাকমা প্রত্যয়ের সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি দেওয়া হলো,

ক. Pali Present Indefinite to Chakma Present Indefinite.

তি (পালি) > ই > এ (চাকমা), গরে (সে করে)
 অস্তি ,, > অন্দি > ন (,,), গরন (তাহারা করে)
 সি ,, > স > চ (,,), গরচ (তুমি কর)
 থ ,, > হ > অ (,,), গর (তোমরা কর)
 মি ,, > দ্দি > ই (,,), গরি (আমরা করি)
 ম ,, > ম্ > ং (,,), গরং (আমি করি)

খ. Pali Optative to Chakma Present Perfect.

এয় (ya (পালি) > ইয় > ইয়ে চাকমা, লইয়ে (সে লইয়াছে)
 এয়ুং (yung) ,, > ইয়ম্ > ইয়ন (,,), লইয়ন (তাহারা লইয়াছে)
 এয়াসি (yasi) ,, > ইয়স্ > ইয়চ, (,,), লইয়চ (তুমি লইয়াছ)
 এয়াথ (yatha) ,, > ইয়াহ্ > ইয় (,,), লইয় (তোমরা লইয়াছ)
 এয়ামি (yami) ,, > ইয়াই > ইয়েই (,,), লইয়েই (আমরা লইয়াছি)
 এয়াম (yama) ,, > ইয়ম্ > ইয়ং (,,), লইয়ং (আমি লইয়াছি)

চাকমা বর্ণমালা :

চাকমা বর্ণগুলি সম্পর্কে Dr. G. A. Grierson এর কিছু বক্তব্য-বিনয়ে
প্রদত্ত হলো,

1. It is written in an alphabet which allowing for its cur-
sive form, is almost identical with the Khmer character,
which was formerly in use in Combodia, Laos, Annam,
Siam, and at least, the southern part of Burma. The
Khmer alphabet is in its turn, the same as that which
was current in the south of India in the sixth and
seventh centuries. The Burmese character is derived
from it, but is much more corrupted than the Chakma.
2. The ahom alphabet is an old form of that which under
various forms is current for Khamti and Shan but not
so complete as those of Burmese and Chakma.
3. তিনি আহোম বর্ণমালা সম্পর্কে বলেন, Every consonant has
the letter a inherent in it, the same occurs in Chak-
ma spoken in Chittagong Hill Tracts, which is an
Aryan language using an alphabet belonging to the
same group as that of ahom.

Dr. G. A. Grierson, Linguistic Survey of India,
Vol V, Part—I, P. 321.

Dr. G. A. Grierson Linguistic Survey of India,
Vol. I, Part—I, P. 77.

Dr. G. A. Grierson, Linguistic Survey of India,
Vol. II, P. 85.

চাকমা সাহিত্যের পটভূমি

সুগত চাকমা

চাকমা সাহিত্যের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন এবং উজ্জ্বল না হলেও খুব একটা অগৌরবের নয়। এর অন্ততঃ দুই শত বৎসরের লিখিত রূপ আছে যা যে কোন একটা উপজাতীয় ভাষার পক্ষে যথেষ্ট গৌরবের বিষয়। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে এবং ঐ বর্ণে প্রচুর সংখ্যক বই লিখিত হয়েছে, এখনও পর্যন্ত গ্রামদেশে ওঝা এবং লুরি বা রাউলী নামক এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সম্প্রদায় চাকমা বর্ণে নিজেদের শাস্ত্রগুলি লিখে জীবন ধারণ করছে

সাহিত্যক্ষেত্রে চাকমা বর্ণমালার ব্যবহার চাকমা ভাষায় কবে থেকে শুরু হয়েছে তা সঠিক ভাবে বলা না গেলেও অন্ততঃ এর ব্যবহার কম করেও দুই শত বৎসর পূর্বে হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে কবি শিবচরণ রচিত 'গোঞ্জন লামা' নামক কাব্য গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডঃ বেণী মাধববড়ুয়া আধুনালুপ্ত 'গৈরিকা' পত্রিকায় শিবচরণের 'গীতপদ' নামক প্রবন্ধে এর রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীতে মনে করলেও বর্তমানে অনেকেরই ধারণা ঐটি ১৭২২ অথবা ১৭৭৭ সনেই রচিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

সে যাক, গোঞ্জন লামা বাদেও চাকমা ভাষায় প্রচুর সংখ্যক পালাগান বারমাসী, কবিতা প্রভৃতি লিখিত হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালে নাটক, অভিধান, গল্প এবং প্রবন্ধের মত মননশীল ও রসোত্তীর্ণ বিভিন্ন রচনাও লিখিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে তরুণদের প্রচেষ্টায় দু'একটি সাময়িকী, সংকলন ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত চাকমা ভাষায় গান ও সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এতে দিন দিন চাকমা ভাষা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

এখানে চাকমা সাহিত্যের কথা বলতে গেলে স্বভাবতই চাকমাদের বিজ্ঞানুরাগ ও বর্ণমালার কথাও এসে পড়ে। চাকমা বর্ণমালায় লিখিত প্রচুর সংখ্যক বইয়ের পাণ্ডুলিপি এ যাবত পাওয়া গেছে। তার মধ্যে লুরি বা রাউলীদের ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ‘আঘরতারা’, ওঝাদের ঔষধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ‘তাহ্লিক শাস্ত্র’, যৌন বিষয়ক গ্রন্থ ‘লদিশাস্ত্র’ এবং যোগ ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে লিখিত ‘ভেদ তত্ত্ব’ ও ‘বায়ুভেদ’ নামক বইগুলি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আঘরতারা বিকৃত পালি ভাষায় এবং তাহ্লিক শাস্ত্রের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি চাকমা ভাষায় রচিত আর বাকী বইগুলির পাণ্ডুলিপি চাকমা বর্ণে বাংলা ভাষায় এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যিকদের আরও দু’টি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি চাকমা বর্ণে এখানে পাওয়া গেছে এগুলি হলো ১৭২৬ খ্রষ্টাব্দ দিকের কবি নিধিরাম আচার্যের রচিত বিজ্ঞানসুন্দর-পুঁথি ও অষ্টটি অষ্ট একজন কবির রচিত ‘গোরক্ষ বিজয় পুঁথি’।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে চাকমারা বহু পূর্বকাল থেকে বিজ্ঞানুরাগী ছিল। এমনকি কবি শিবচরণের গোজেন লামায়ও তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

“শোনরে পণ্ডিত পোবুয়া ভেই
দ্বিবা অক্ষরে তরি যেই।

.....

জ্ঞানী ধ্যানী যেই দেবত
জন্ম হোতুংগেই সেই দেবত ॥”



চাকমাদের এই বিজ্ঞানুরাগ শুধু কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরঞ্চ রাজা প্রজা সবার কাছে সমান ভাবে প্রিয় ছিল। এ ক্ষেত্রে রাণী কালিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীনীলকমল দাস ও ফুল চন্দ্র লোথক কর্তৃক বর্মী ভাষা থেকে ‘খাতুওয়াং’ বইয়ের বঙ্গানুবাদ হিসেবে ‘বৌদ্ধ রঞ্জিকা’র কথা উল্লেখ করা যায়। অনুবাদক উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় রাণী কালিন্দীর

পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কথাগুলি লিখেন,

“ শ্রীমতি কালিন্দী রাণী ধর্মবজ্র রাজরাণী
পূণ্যবতী সুশীলা মহিলা
তান আজ্ঞা বলে দাস শ্রী নীলকমলে
এ বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রকাশিলা ”

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে এ যাবত কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের উপর লিখিত বইয়ের মধ্যে ‘বৌদ্ধ রঞ্জিকা’ই সর্বপ্রাচীন। এটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বা লা বর্ণে মুদ্রিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি চাকমাদের এই অনুরাগের কারণ সম্ভবতঃ বহু পূর্ব কাল থেকে বাংগালীরা চাকমাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত ছিল। এ ছাড়া আরও একটি বিশেষ কারণ হলো, চাকমা ভাষা বাংলা ও আসামীর সাথে একই পরিবারভুক্ত অর্থাৎ ইন্দো-এরিয়ান ফেমিলির অন্তর্গত। এই কারণে চাকমারা সহজেই বাংলা ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। এই যোগাযোগ রাণী কালিন্দীর সময় (১৮৩২-৭২ ইং) আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর রাজ্যকার্যে হিন্দু বাংগালী কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং নিজেও বাংলা শিখেন। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে চাকমা রাজ্যকার্যে ফারসী ভাষা ব্যবহৃত হতো। তবে রাণী কালিন্দী সংঘরাজ সারমেধ বা সারমিত্র মহাস্ববিরকে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্মান স্বরূপ যে পদকটি দেন তাতে চাকমা বর্ণ খোদিত ছিল। চাকমাদের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচলনের আরও একটা কারণ ছিল, তা হলো ১৮৬৩ সনে চল্লিশোগায় Elementary Education স্কুলে বাংলা ক্লাশের চালু ও ১৮৯০ সনে রাংগামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এর ফলে পরবর্তীকালে রাজা ভুবন মোহন রায়ের সময় (১৮৯৭-১৯৩৩) শ্রী ধর্মধন পণ্ডিত চাকমা বর্ণে ‘চান্দবী-বারমাচ’ নামক যে কাব্যগ্রন্থটি লিখেন তাতে চাকমা বর্ণে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। ঐ সময় রাজা ভুবন মোহন রায় নিজেও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ‘চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস’ নামক একটি পুস্তিকা লিখেন।

এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ১৮৮৬ সনে খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতের এলাহাবাদস্থ একটি প্রেস থেকে সর্বপ্রথম বাইবেলের একটি চাকমা অনুবাদ চাকমা বর্ণে প্রকাশ করে। কিন্তু যেহেতু তৎপূর্বে রাণী কালিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম চাকমাদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেহেতু খৃষ্টানদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ফলে পরবর্তী কালে ১৯৪০ সনে মিঃ মিলার কর্তৃক বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় লিখিত ‘চাকমা প্রাইমার’ নামক শিশুপাঠ্য বইটি চালুর প্রচেষ্টা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সমর্থন করেননি।

তবে মিঃ মিলার ছাড়াও অনেকে তৎপূর্বে বাংলা বর্ণে চাকমা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ঐ সময় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ফিরিঙচান কর্তৃক বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় ‘আলমি মিলার কবিতা’ নামে একটি চাকমা কবিতা হাওপ্রেসের মাধ্যমে ছাপার অঙ্করে প্রকাশিত হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চাকমাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রাণী বিনীতারায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ‘গৈরিকা’ নামে সর্বপ্রথম একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা জন্ম লাভ করলে চাকমা লেখকগণ গভীর ভাবে ঐ পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

গৈরিকার এই পথযাত্রা ১৯৫১ সন পর্যন্ত চলেছিল। গৈরিকা তার এই দীর্ঘ পথযাত্রায় মাঝে মাঝে ‘ছ’ একটি চাকমা গান ও কবিতা প্রকাশ করে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় শিল্পী চুনিলাল দেওয়ানের ‘ঘর ছয়ারত এইনে কল্লা সিবা দাগের মরে’ নামক একটি গান ও পরবর্তীকালে শ্রী মুকুন্দ তালুকদারের ‘পুংগ কদা’ নামক একটি কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ পত্রিকায় স্বর্গীয় কবি সলিল রায়ের ‘এই জীবনত চেইয়ং তরে ন পাং তুয়াদ চাং’ নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু যেহেতু গৈরিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা, সেহেতু গৈরিকা সলিল রায় ছাড়া আর কোন লেখককেই চাকমা ভাষার সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। তবে গৈরিকাই ছিল প্রথম পত্রিকা যা বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় ‘ছ’ একটি গান ও কবিতা প্রকাশের এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

১৯৫১ সনে গৈরিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোন পত্র-পত্রিকা না থাকায় সাহিত্য চর্চাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর শ্রীহরকিশোর চাকমা 'চাকমা লেখা শিক্ষা' নামে একটি চাকমা বর্ণমালার বই প্রকাশ করেন। ঐ সমসাময়িক শ্রীনোয়ারাম চাকমা 'চাকমার পঞ্চম শিক্ষা' নামে আরও একটি চাকমা বর্ণমালার বই ছাপার অঙ্করে প্রকাশ করেন। শেষোক্ত বইটি ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে শিক্ষিত চাকমাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাকিস্তান আমলে নোয়ারাম চাকমার 'চাকমার পঞ্চম শিক্ষা' নামক বইটি প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য ঈষ্ট পাকিস্তান স্কুলস্ টেক্সট বুক বোর্ডের' অনুমতি লাভ করেছিল।

পরবর্তী কালে শ্রীসলিল রায় বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় গান লিখায় মনো-নিবেশ করেন। তিনি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে বেশ কয়েকটি চাকমা গান লিখেণ। তাঁর রচিত কয়েকটি গান ঐ সময়ে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম থেকে শ্রীসুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা কর্তৃক প্রচারিত হয়। এখনও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শিল্পীরা 'নমঃ বুদ্ধ শরণত' নামে যে গানটি গেয়ে থাকে ঐটি তাঁর ঐ সময়ের রচনা।

১৯৬৬ সনে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে ঝরণা পার্বত্য চট্টগ্রামে বান্দরবান থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকায় শ্রীকান্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা 'রাধামন-ধনপুদি' পালা সংগ্রহ করে বেশ কিছু অংশ প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকাটি ৬টি ইস্যুর পর থেমে গেলে তাঁর সংগৃহীত রাধামন-ধনপুদির পূর্ণ খণ্ডটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

সাম্প্রতিক কালে 'রাংগামাটি ঈসথেটিক কাউন্সিল' নামে একটি সংগঠন কান্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার ঐ সংগ্রহটিকে 'রাধামন-ধনপুদি' (২য় খণ্ড) নামে ছাপার অঙ্করে বের করেছে। ঝরণার পরে ১৯৬৭ সনে রাংগামাটিতে শ্রীবিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক 'পার্বত্য বাণী' নামে আরও একটি মাসিক পত্রিকা জন্ম লাভ করে ১৯৭০ সন পর্যন্ত চলেছিল।

এই সময় ননাধন কর্তৃক ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে রাংগামাটিতে 'রাঙামাত্যা' নামে প্রথম

একটি চাকমা কবিতার বই ১২টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় এবং চাকমা সাহিত্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে তরুণদেরকে উৎসাহিত করে তোলে। এর পর বাংলাদেশ স্বাধীন হ'লে তরুণদের মনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। একে একে অনেকগুলি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম লাভ করে। নিম্নে তাদের কয়েকটির নাম উল্লেখ করা গেল—

- ক. | ছুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর (বা সংক্ষেপে 'জুভাপ্রদ')
- খ. মুড়োলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি
- গ. গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠি
- ঘ. জাগরণী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি
- ঙ. উন্মাদ শিল্পী গোষ্ঠি
- চ. রাধামন সাহিত্য গোষ্ঠি ইত্যাদি।

ঐ সমস্ত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি দীর্ঘ কাল যাবত উপজাতীয় সাহিত্য ও সংগীতকে নেতৃত্ব দান করে এবং প্রথমোক্ত দুইটি সংগঠন উপজাতীয় ভাষায় বিশেষতঃ চাকমা ভাষায় অনেকগুলি বই প্রকাশ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে আজকের চাকমা ভাষার এই পথযাত্রা সুগম হয়।

[* উক্ত চাকমা সাহিত্যের পটভূমি প্রবন্ধের কিছু অংশ ৬-২-১৯৮২ ইং তারিখে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সেমিনারে পঠিত হয়]

শিবচরণ ও গোব্বেন' লামা :

চাকমা কবিদের মধ্যে শিবচরণকে আদি কবি বলা হয়। তাঁর রচিত গোব্বেন' লামা দীর্ঘকাল ধরে চাকমা সমাজে কাব্যরসিকদেরকে কবিতা পাঠে উদ্বুদ্ধ করেছে। অত্যাধি এই গোব্বেন' লামার জনপ্রিয়তা চাকমা সমাজে পূর্বের মতই অক্ষুন্ন রয়েছে। কবিতায় “এগার হাজার চুরাখি সন। ফলনাবারে সাধুগর এগামন ॥” লদটি থেকে অেকে গোব্বেন' লামার রচনাকাল ১০৮৪ (মগী) এবং অনেকে ১১৮৪ (বাংলা সন) মনে করেন। ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন তথ্যের আলোকে ২য় মতটি সত্য বলে মনে হয়। এতে ১১৮৪ বাংলা

সন ধরলে গোবেন' লামার ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজা শেরদৌলত খানের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। ঐ সময় চাকমা রাজা শেরদৌলত খানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হচ্ছিল। সম্ভবতঃ এ কারণে গোবেন' লামায় “হারন্দি রাজার দেচ লাগ ন পেতুং। অঘাদে অপথে যেই ন পেতুং॥” ইত্যাদি পদগুলি পাওয়া যায়। এ ছাড়া “দেবান আবুজিলে বীর সাধি” পদটিতে তৎকালে বীর ছিল বলে জানা যায়। উল্লেখ্য রাজা শেরদৌলত খানের সেনাপতি রণুখা দেবান তৎকালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাতীয় বীর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ রানুনিয়ার পাশেপাশে কাপ্তাইয়ের অনতিদূরে শিলক নদীর তীরে হয়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

উল্লেখ্য কবি শিবচরণও কাপ্তাইয়ের অনতিদূরে অবস্থিত নাড়াই পাহাড়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ধুংগি এবং মাতার নাম ধর্মাবী চাকমা। কবির শৈশবকালে তাঁদের পরিবার নাড়াই পাহাড় থেকে বান্দরবান জেলার তৈনমুড়ী (তৈনছড়ী) নদীর তীরে চলে যায়। সেখানেই কবির শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি কেটেছিল। তিনি অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সে কারণে শৈশব থেকে শিবচরণ ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। যার ফলে পরবর্তী কালে ধ্যান, সাধনা এবং কাব্যচর্চার প্রতি তাঁর মনযোগ আকৃষ্ট হয়। তিনি শৈশবকালে তাঁর মাতুল সম্পর্কীয় হরমনির কাছে লেখাপড়া শিখেন। এ সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকেরা তাঁর জীবন কাহিনী ও বংশধারার উপর শ্রী যামিনী রঞ্জন চাকমা কর্তৃক লিখিত উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাহিত্য পত্রিকা গিরিনির্ঝর ২য় সংখ্যা (মে, ১৯৮২ ইং) প্রকাশিত প্রবন্ধ “সাধক শিবচরণ” অধিক তথ্যের জন্য পড়তে পারেন।

কবি শিবচরণের 'গোবোন' লামা থেকে কিছু অংশ :

(১ম ও ২য় লামা থেকে)

উজানি ছড়া লামনি ধার ।
ন এল সিরিতি জলংকার ॥
জল' উবুরে গোৰ্জো থল ।
গোবোনে বানেল জীব সকল ॥
আরেয়ে মানয়ে যার জনম ।
আগে সালাম তুং তার চরণ ॥
গরে বিধির দয়া হোক ।
তিন দেব' চরণত সালাম রোখ ॥

মা সরস্বতী সালামত ।
যোগেই দিদিগি গীতপদ ॥

যে বর মাগে সে বর পায় ।
গোবোনে বর দিলে ন ফুরায় ॥

ঘুরি চেলুং চোখ ভরি ।
মা বাব' পারা নেই দেচ
ভরি ॥

মা বাব' চরণে ভুজিলে ।
সগল তির্থ ফল পায় ভিলে ॥

শুনরে পণ্ডিত পোড়ভুয়া ভেই ।
দ্বিবা অক্ষরে তরি যেই ॥

অপার পানি সাগরে ।
তিরিচতিন জাদিভাচ পার্তুং মুই
আথরে ॥

(বঙ্গানুবাদ)

উজান হতে শ্রোত নিম্নে বহে যায় ।
ছিল না, সৃষ্টি, শুধু জল উছলায় ॥
জলের উপর যবে হইল স্থল ।
পরম গোবোন সৃজিলেন এই জীবসকল ॥
যেবা হতে এ মানব লভিল জনম ।
সর্বাত্রে প্রণাম জানাই তাঁহার চরণ ।
আমারে বিধির দয়া হোক ।
তিন দেবের চরণে প্রণাম থাকুক ॥

মা সরস্বতী প্রণাম তব পদ ।
যোগিয়ে দাও মা মোরে গীতপদ ॥

যে বর খুঁজে সে বর পায় ।
গোবোনে বর দিলে কভু না ফুরায় ॥

ঘুরিয়াছি কত দেশ কত গ্রাম ।
নাহি কোথা কোন জন আমার মা বাপের
সমান ॥

যেবা সেবে মা বাপের চরণ ।
সকল তীর্থ লভে তাহার কারণ ॥

শুন হে পণ্ডিত পড়ুয়া ভাই ।
দু'টি অক্ষরে তরিয়া যাই ॥

অপার পানির সাগরে ।
তিরিশতিন জাতি ভাষা পারি যেন
আথরে ॥

(৩য় ও ৪র্থ লামা থেকে)

তদাত বেরেই কাবরে ।

আরাধনা গরং হাত জোড়ে ॥

হীন কূলে ন যেহুং ।

হুখ্যা কূলে ন হোহুং ॥

হাদে ন গোর্খুং জীববধ ।

যুগে যুগে ন পোর্খুং দোজগত ॥

পোড়ুয়া পণ্ডিত যেই দেখে

জন্ম হোহুং গোই সেই দেখে ॥

হারঙ্গি রাজার লেচ লাগা ন পেহুং ।

অঘাদে অপথে যেই ন পেহুং ॥

সাত জেই সাত বোন লাগ পেহুং ।

ননেয়া খুলাভুয়া মুই হোহুং ॥

সনার ধুলনত ধুলেদাক ।

দেবর ভঙানি ভঙেদাক ॥

সমারে বন্ধু পাং পারা ।

লোগ কুহুমে সবপুৱা ॥

মাধা জ্বা চুল ধরোক ।

মধুর হদ দিভা চোখ ॥

তদাত পেহুং দেব গড়ন ।

বাহুৱা অঝার বুক ভরন ॥

ছানে শিক্যায় গড়নে ।

রুবে রঙে পেহুং গোই সবপানে ॥

কঠে বেড়িয়া শুভ্র কাপড়ে

আরাধনা করি আমি হাত জোড়ে ॥

হীন কূলে নাহি যেন যাই ।

হুখ যেন কভু নাহি পাই ॥

হাতে যেন না করি জীববধ

যুগে যুগে না হোক দোজখ ॥

পড়ুয়া পণ্ডিত যেই দেশে ।

জন্ম লভি যেন সেই দেশে ॥

পরাজিত রাজদেশ সাক্ষাৎ যেন নাহি হয়

অঘাটে অপথে যেন যেতে নাহি হয় ॥

সাত ভাই সাত বোন মাঝে ।

সকলের ছোট হবো আমি যে ॥

সোনার দোলনায় দোলাবে ।

স্বর্গ হাওয়ায় উড়াবে ॥

সঙ্গে বন্ধু ইষ্ট যারা ।

নিত্য রবে গৃহে ভরা ॥

শিরে চুল শোভা হোক

মধুর হোক হুঁটি চোখ ॥

কঠে হোক দেবের গড়ন ।

প্রশস্ত বাহু আর বক্ষ ভরণ ॥

শান শওকতময় জীবনে ।

শোভা রবে সব খানে ॥

সর্ব লোকে পূজিদাক ।
দেলে শতুরে ভজিদাক ॥
হাদত পেছুং লেঘা বর ।
কেয়াত পেছুং রুববর ॥

সর্বলোকে পূজিবে ।
শত্রু হলেও ভজিবে ॥
হাতে হবে লেখার বর ।
দেহে হবে রূপ বর ॥

(৫ম লামা থেকে)

জেনে মাগং ধন' বর ।
বাঙে মাগং জন' বর ॥
ধনে সম্পাদে সবপুরা ।
জুড়ি পার্ভুংগোই হেটঘড়া ॥

ডানে চাহি ধন বর ।
বামে চাহি জন বর ॥
ধনে সম্পাদে সব পুরা ।
সাথে রবে হাতী ঘোড়া ॥

হাল্যা আবুজিলে “লেই” সাধি ।
জুমুয়া আবুজিলে “টং” সাধি ॥

চাষা হলে “লেই” সাধি ।
জুমিয়া হলে “টং” সাধি ॥

দেবান আবুজিলে “বীর” সাধি ।
রাজা আবুজিলে “চক্রবর্তী” সাধি ॥

“দেবান” হলে বীর সাধি ।
“রাজা” হলে চক্রবর্তী সাধি ॥

চাকমা লোকসাহিত্য :

চাকমা লোক সাহিত্যের উপকরণ. এক কথায় বিপুল । অজস্র ছড়া, ধাঁধা, গল্প, প্রবাদ, রূপকথা ইত্যাদি চাকমাদের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে । বার-মাসো এবং পালাগানের সংখ্যাও কম নয় । এগুলির কোন কোনটির লিখিত রূপ আছে । আবার কোন কোনটি লোক মুখে বংশ পরম্পরা চলে আসছে । চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি “রাধামন-ধনপুদি” এবং “চাদিগাও ছারা” । এক নাগারে “গেংগুলীরা” সাতদিন সাত রাত গেয়েও ফুরাতে পারেনা । ঐ গুলিতে অজস্র কাহিনী এবং উপকাহিনী বৃক্ষের ডালপালার মত ছড়িয়ে আছে । অত্যাশ্চর্য পালাগানগুলিও এত দীর্ঘ যে এগুলির লিখিত রূপ দেওয়া হলে প্রত্যেকটিকে এক একটি কাব্য বলা যেত । আলোচ্য পরিচ্ছেদে চাকমাদের লোক সাহিত্যের উপর খুব সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি দেওয়া গেল ।

ক। ছড়া : চাকমা

বাংলা

কবাজাং কবাজাং
মোন' উরে বাহু যাং ।
চাক ন খাং ঘিলুক খাং
ইক্কুয়া বডালই ঘরত যাং ॥

কবাজাং কবাজাং—
জুম পাহাড়ে বেড়াতে যাবো ।
চাক খাবো না ঘিলু খাবো
একটি ডিম নিয়ে বাড়ী যাবো ।

থাচ্ থুচ্ থেচ্
ত' মামু ঘরত যেচ্ ।
ত' মাগু দিব কুহুরা কাবি
চিংঘিলালই থেচ ॥

টাস্ টুস্ টাস্
মামার বাড়ী যাস্ ।
মামা দেবে মোরগ কেটে
গিলা কলিজা খাস্ ॥

তেনতেঙরি বাহুরা বান (২)
কার্জ্যা চৌলভাত দ্বিভা রান ।
দাদা যিয়ে মগ পাড়া
ভুজি যিয়ে ভাত চড়া ।
দাদা মোগর দীঘল চুল
রানদে রানদে চাম্বাফুল ।
চাম্বা ফুল' তলে
হরিণ দিভা লরে
হরিণ নয় চঙরা
চোগ' পাদা ভঙরা

ফরিঙ ফরিঙ ঢে'কি ভান্
কারা চালের ভাত হু'টো র'াধ ।
দাদা গেছে মগ পাড়া
বৌদি গেছে চাল ধুতে ।
দাদা-বউয়ের দীঘল চুল
র'াধতে র'াধতে চম্পাফুল ।
চম্পা ফুলের তলে
হু'টো হরিণ নড়ে ।
হরিণ নয় সম্বর
চোখের পাতা ভ্রমর ॥

খ। ধাঁধা : চাকমা

বাংলা

এক হাত গাচ্ছুয়া
গুলি ধরণ পাচ্ছুয়া ।
(উত্তর হাত)

এক হাত গাছটি
ফল ধরে পাঁচটি
(উত্তর হাত)

এই আঘে এই নেই
এ' দেখত তে নেই ।
(উত্তর ঝিগিলানি)

এই আছে এই নেই
এই দেশে ও নেই ।
(উত্তর বিজলী)

বিল্ল বগা বিলত চরে
বিল শুগেলে বগা মরে ।
(উত্তর বাতি)

বিলের বক বিলে চরে
বিল শুকালে বক মরে ।
(উত্তর প্রদীপ)

ফেল্লুং কাল্যা জিরা
উধিলাক সরক চারা
ফুদিলাক মালতী ফুল
ধরিলাক করঙা ।
(উত্তর সম্যাবিজি)

ফেল্লুম কাল জিরা
উঠলো সবুজ চারা
ফুটলো মালতী ফুল
ধরলো কামরাঙ্গা ।
(উত্তর সরিষা বিচি)

এককুনি ভুইয়ত চেরকুনি মাথা
পেখ পর্তন জধা জধা
মরা পেঘে যুদ্ধ গরে
গম মানঝো বুঝি পারে ।
(উত্তর পাঝা-খারা)

এক কোণা ভুইয়ে চারকোণা মাথা
পাখী পড়ছে জোড়ায় জোড়ায়
মরা পাখী যুদ্ধ করে
বুঝিমান বুঝতে পারে ।
(উত্তর পাশাখেলা)

গ । প্রবাদ (ডাঙ্গ' কথা)

চাকমা

বাংলা

ভাত ভালা চুখা খা
পথ ভালা বেঙা যা ।

ভাত ভাল হলে তরকারি ছাড়াও খাওয়া যায়
আর পথ ভাল হলে বাঁকা পথেও যাওয়া যায় ।

উপদেশ :—উত্তম পথ যদি দীর্ঘ এবং বক্রও হয় তবু তা' দিয়ে যাওয়া উচিত ।
কারণ মানুষের নিরাপত্তাই সবচেয়ে জরুরী বিষয় ।

মার গুদিয়ে পোয়া
ভুইয়র গুদিয়ে রুয়া ।

মায়ের গুণে ছেলে
ভুইয়ের গুণে রুয়া ।

উপদেশ :—উত্তম সন্তানের জন্ম উত্তম মায়ের প্রয়োজন । যেহেতু মায়ের
শিক্ষায়ই সন্তান বড় হয় ।

জাদে জাত তগায়

জাতি জাতিকে খুঁজে

কাঙারা গাত তগায়।

কাঁকড়া গর্তকে খুঁজে।

উপদেশ :—স্বজাতি যে কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেয়। আপদে বিপদে মানুষ স্বজাতীয় লোকদের মধোই আশ্রয় খোঁজে। স্বজাতিই তার জ্ঞান নিরাপদ আশ্রয়।

গাঝে গাছ বানে

বেত দিয়ে গাছ বাঁধা হয়

হেঁদে হেঁত বানে।

হাতী দিয়ে হাতী ধরা হয়।

উপদেশ :—ক্ষমতাধরকে অশ্রু কোন ক্ষমতাধর দিয়ে, ধনীকে অশ্রু কোন ধনী দিয়ে, গুণীকে অশ্রু কোন গুণী দিয়ে ধরতে হয়। কারণ যে কোন ব্যক্তিকে ধরতে হলে ঐ ব্যক্তির সমপক্ষ অশ্রু কোন ব্যক্তি দিয়ে ধরতে হয়।

এক মোক্যা সুঘর ভাত

এক বিয়েতে সুখের ভাত

দ্বি মোক্যা লাধি ভাত

দু' বিয়েতে লাধি ভাত

তিন মোক্যা কবালত হাত।

তিন বিয়েতে কপালে হাত।

উপদেশ :—অধিক বিয়ে সুখের হয় না।

গল্প থেকে প্রবাদ :

যে কুণ্ডর' লেজ বেঙা চুমাত ভরলে উজু ন হয়

(যে কুকুরের লেজ বাঁকা চোঙ্গায় ঢুকালেও সোজা হয় না)

একবার নাকি একজন লোক একটি চেরাগ পেল। যেমন তেমন চেরাগ নয় আলাউদ্দীনের আশ্চর্য চেরাগের মতই চেরাগ। ওতে ঘষলেই একটা দৈত্য এসে হাজীর হয়। তাকে যে আদেশ দেওয়া হয় সে তৎক্ষণাৎ তা' করে। এমন কোন কাজ নেই যা সে দু'একদিনের মধ্যে সম্পাদন করতে পারেনা। এতে লোকটার একটা বিরাট সুযোগ যেমন জুটলো সে সাথে একটা মহা-বিপদও জুটলো। ঐ দৈত্যটাকে কাজ দিতে না পারলে সে তাকে খাবে

থাবে বলে হুমকি দিল। একথা শুনে লোকটার চেরাগ পাওয়ার সব আনন্দই নষ্ট হলো। সে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগলো। তাকে এত বেশী ভয় চেপে ধরলো সে দৈত্যটাকে নতুন কাজ দিতেও ভুলে গেল। এতে একদিন দৈত্যটা তার কাছে এসে হয় তাকে কাজ দিতে, নয় সে তাকে খেয়ে ফেলবে বলে ভয় দেখাতে লাগলো। তখন লোকটা দেখলো বাঁচার আর কোন উপায় নেই। এ সময় হঠাৎ তার কুকুরটা দৈত্যটাকে দেখতে পেয়ে শুরু করলো ভেউ ভেউ। এতে লোকটার বুদ্ধি গেল খুলে। সে তৎক্ষণাৎ দৈত্যটাকে বললো, “এবার তোমাকে সহজ একটি কাজ করতে হবে। কাজটি হলো আমার কুকুরের লেজটি তোমাকে সোজা করতে হবে। ওকে মেরে ফেললে চলবে না। এই তোমায় শেষ কাজ।”

দৈত্যটার মাথায় বুদ্ধি কম থাকলেও কাজটা তার খুব বেশী কঠিন মনে হলো না। সে বন থেকে একটা বাঁশের চোঙ্গা কেটে এনে কুকুরের লেজটা চোঙ্গায় ঢুকিয়ে দিল। এতে কুকুরের লেজটা সোজা হলো বলে তার মনে হলো। কিন্তু যেই চোঙ্গাটা সে টেনে বের করলো, হা ঈশ্বর! লেজটা আবার বাঁকা হয়ে গেল। তখন সে পুনরায় ঐ কাজে মন দিল। এবং সারাদিন একই ভাবে চোঙ্গা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো। আর তখন লোকটা পরম নিশ্চিন্তে পড়লো ঘুমিয়ে।

উপদেশ :—জগতে এমন কতগুলি জন্মগত শয়তান আছে যাদের চরিত্র কোন ক্রমেই সংশোধন যোগ্য নয়। ইংরেজীতে যাকে বলে **Black will take no other hue** (অনেকটা কুকুরের বাঁকা লেজের মত তাদের চরিত্রও কুঠিল, কখনও সোজা হবার নয়।)

আরগা উবর দারগা কস্তুম হা, গাঙকুলে নেযেই ভিজ়েই ভিজ়েই থা

(শক্তের উপর শক্ত কত বড় মুখ নদীর জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে থাও)

একবার একটা শিয়াল বনে একটা কাছিম পেল। শিয়াল জীবনেও কাছিম খায়নি। ওটা কিভাবে খেতে হয় তা’ সে জানেনা। কাছিমের পিঠি খুব শক্ত।

শিয়াল ছ'এক কামড় দিয়ে ওটাকে খেতে বুখা চেষ্টা করলো। বারংবার চেষ্টার ফলে তার দাঁত ভেঙ্গে যাবার যোগাড়। কি করা যার? সে ভাবতে বসলো। কাছিম শিয়ালের মনের ভাব বুঝে বললো “আরে পণ্ডিত, নদীর জলে আমাকে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাও।” শিয়াল ভাবলো, কথাটা মন্দ নয়। ওতে হয়তো কাছিমের শক্ত পিঠ নরমও হতে পারে। সে কাছিমকে নদীতে ভিজাতে যেই নিল অমনি কাছিম জলে লাফ দিয়ে চোখের পলকে হাওয়া।

উপদেশ :—অপদার্থ লোক দিয়ে কোন কাজ হয় না। বিশেষতঃ তার যদি ঐ কাজে কোন অভিজ্ঞতা না থাকে। (গল্পে যেমন কাছিম খাওয়া সম্পর্কে শিয়ালের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।)

পেজায় কুলকুলায় খুরল্যা সনারতুক পায়

পেঁচা কুলকুল করে কাঠটোকরা সোনার মুকুট পরে।

চাকমা পৌরাণিক কাহিনী মতে মা লক্ষ্মীমা স্বর্গ থেকে বুধবারে বিয়াত্রার সাথে মর্ত্যলোকে এলেন। তাঁকে স্বর্গ থেকে একটি শূকর পিঠে চড়িয়ে ৭টি পাহাড় পর্বত পার করে দিল। এরপর মা লক্ষ্মীমা শূকরসহ একটি কাঁকড়ার পিঠে চড়ে তেরটি বড় বড় নদী পার হয়ে একটি বিশাল সমুদ্রতীরে পৌঁছলেন। ঐ সমুদ্রের একতীরে স্বর্গাঞ্চল অস্থতীরে পৃথিবী। এই সময় এক মাকড়সা এসে এপার ওপার দুপারকে আঁশ দিয়ে যুক্ত করে স্বর্গ ও মর্ত্যে সেতু রচনা করলো। মা লক্ষ্মীমা শূকরের পিঠে, শূকর কাঁকড়ার পিঠে, কাঁকড়া একটি কাছিমের পিঠে চড়ে ঐ আঁশের সেতুর উপর দিয়ে মর্ত্যলোকে বুধবারে পৌঁছলেন। চারিদিকে আনন্দ বয়ে গেল। সবাই মা লক্ষ্মীমার সেবায় ছুটে এল। ঐ দিন পেঁচা মা লক্ষ্মীমাকে পিঠে তুলে উড়ে উড়ে গোটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখালো। এই আনন্দে পেঁচা সারারাত গান গাইলো।

সবাই রাত্রে পেঁচার ঐ গান শুনে ভাবলো এমন লক্ষীভক্ত আর হয়না। যে পাখী ঐ গান করলো তাকে সবাই মিলে একটা সোনার মুকুট দেওয়ার সাব্যস্ত করলো। পরদিন ভোর হতে পেঁচা ধুমানোর জ্ঞান গাছের খোলে যখন ঢুকে পড়লো তখন ঐ গাছে একটা কাঠটোকরা সকাল থেকে ঠক্ ঠক্ করে পোকা

খেতে লাগলো। সবাই মনে করলো এই সেই পাখী যে মা লক্ষ্মীমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। অতএব সবাই মিলে তার মাথায় সোনার মুকুট পড়ালো।

উপদেশ :—কখনও কখনও একের সৌভাগ্য অপরে ভোগ করে। (সংসারে পৈঁচার মত অনেকে খেটে মরে আর কাঠ টোকরার মত অনেকে বিনা পরিশ্রমে অপরের কর্মফল ভোগ করে।)

* বাংলার “প্রবাদ” শব্দের চাকমা প্রতি শব্দ হলো “ড’গ’কধা”। “ডাগ’কধা” শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হলো “ডাকের কথা”। এ থেকে চাকমাদের “ডাগ’কধা”র সাথে বাংলা ও অহমীয়ার “ডাকের বচন” শব্দের যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক কালে কলিকাতা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ছল্লাল চৌধুরী “চাকমা প্রব’দ” নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে অধিক আগ্রহীরা তাঁর গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য চাকমাতে অজস্র প্রবাদ আছে যা যে কোন একটি ভাষার জ্ঞান অবশ্যই গৌরবজনক বিষয়।

* চাকমাতে গল্প, কিংবদন্তী ও রূপকথার সংখ্যাও অনেক। বহু পূর্বকাল থেকে ঈসপের মত ভাল ভাল গল্প কথক ও গুলবাজ চাকমাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে রোঙ্যাবেঙা, নিশিঙ্যা পণ্ডিত এবং সাম্প্রতিক কালের ননাকাজীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ঘ। বারমাসী :

চাকমাদের অনেকগুলি বারমাসী গীত আছে। সচরাচর বিভিন্ন নায়িকার সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করে বারমাসী রচনা করা হয়। চাকমা বারমাসীর মধ্যে চান্দবীর বারমাচ, তান্তাবীর বারমাচ, রস্তনবীর বারমাচ, বৃদ্ধপুদির বারমাচ, কির্বাবীর বারমাচ, মেয়াবীর বারমাচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে তান্তাবীর বারমাসী থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দেওয়া হলো।

[তান্তাবী]

তান্তাবী রান্তাত যায় গুগরি দাদি টানেরলই
 পুরান কথা ঈদত তুলি গুজুরি গুজুরি কানেরলই ॥
 (আঁরে নাদিন তান্তাবী তুল্যা সাঙু পার্জ্যা দিলে কারলাগি) ॥
 তান্তাবী ছড়া ইঝে ইঝায় মাঝে এক কুরুম ।
 তান্তাবীরে দোল দোল কনধে পুনে মাধায় এক সুরুঙ ॥
 তান্তাবী মাগা গরে কদলপুরত যেবাঠায় ।
 গাভুর মর্দে লগে লগে তিনাং ফালাং হবাঠায় ॥
 তান্তাবী গাঙত যায় কুম্ভ ভরে ধুপ্ গরি ।
 গাভুর মর্দে চোগি আঘন খাগাড়া ছবাত চুপ গরি ॥
 তান্তাবী বেন বুনে বেনর তলে বদল ।
 তান্তাবীরে ধরি নিলাক কেরেত কাবা মোনতলা ॥
 তান্তাবী হরিঙ পূজে সে হরিংঙুয়া মরিব
 পুরানা আদাম ফেলে যাদে চোষপানি পড়িব ॥
 তান্তাবী ভাত খায় ইত্তুক ইত্তুক উলু বুল
 গাভুর মর্দে পাড়ি দেদন কুড়ি কুড়ি রেগোচফুল ॥

(অম্ববাদ)

তান্তাবী “রান্তা”য় যায় কুমড়ো লতা টানে ।
 পুরান কথা পড়লে মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ॥
 (হায়রে নাতনী তান্তাবী ঘরের সিঁড়ি নামিয়ে দিলি কারলাগি) ॥
 তান্তাবী মাছ মারে চিংড়ি-মাছে বুড়িময় ।
 তান্তাবীকে সুন্দরী কয় গড়ন যে তার ভাল নয় ॥
 তান্তাবী মানত করে “কদলপুরে” যাবে সে ।
 যুবক দলের সঙ্গে সেথা রঞ্জে দিন যাবে যে ॥

তান্যাবী গাঙে যায় কলসী ভরে দপ্ করে ।
 যুবকদল লুকিয়ে রয় খাগড়া বনে চুপ করে ॥
 তান্যাবী 'বেন' বুনে বেনের নীচে স্ততলি ।
 তান্যাবীকে ধরে নিল "কেরেতকাবা-মোনতলী" ।
 তান্যাবী হরিণ পালে সে হরিণটি মরবে ।
 পুরানো গ্রাম ফেলে যেতে চোখের পানি ঝরবে ॥
 তান্যাবী ভাত খায় সাথে একটু উলু ঝোল ।
 যুবকদলে পেরে আনে কচি কোমল "রেগোচ-ফুল" ॥

- * রাগা = জুমের শেষাবস্থা । কদলপুর-রাঙ্গুনীয়ায় অবস্থিত । ওখানে
- * কেরেতকাবা-মোনতলা : পার্বত্য চাকমাদের একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে ।
- চট্টগ্রামের একটি পাহাড়ীয়া স্থান । আগের দিনে ধর্মীয় উৎসবের সময়
- বুড়ীঘাটের পশ্চিম দিকে অবস্থিত । যুবক যুবতীরা ওখানে খুব যেত ।
- * রেগোচফুল = এক জাতীয় ফুল ।

উভাগীত ও পালাগান :

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকগীতির নাম "উভাগীত" । গ্রামদেশে তরুণ এবং তরুণীরা হৃদয় বিনিময়ের সময় অনেকে উভাগীত গায় । তাই উভাগীতকে প্রেমগীতি বললেও খুব একটা ভুল বলা হবে না । এতে যে সুর আছে সে সুর বাংলাদেশের আর কোথাও নেই । উভাগীত যে ধঙে গাওয়া হয় তাও অগ্ৰত অনুপস্থিত । তাই উভাগীতকে কোন গীতির সাথেই তুলনা করা চলেনা । উভাগীতের একমাত্র পরিচয় উভাগীত নিজেই ।

এই গীতের (উভাগীতের) সুরে চাকমাদের পালাগানও গাওয়া হয় । আর তাই চাকমাদের পালাগানে অবশ্যই উভাগীতের সুর পাওয়া যায় গ্রামদেশে যে চারণ কবিরা এই গীত গায়, তাদের নাম "গেংগুলী" । গেংগুলী যখন পালাগান গায় তখন উপস্থিত শ্রোতারা "রেঙ" দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে এবং গায়ককে উৎসাহিত করে । "রেঙ" হলো এক ধরনের বিশেষ উল্লাস ধ্বনি ।

গেংগুলীরা অর্থের বিনিময়ে গ্রামদেশে পালাগান গায়। এটি তাদের পেশাও। যে গৃহস্থ তাকে গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করে তাকে গায়কের (গেংগুলীর) পারিশ্রমিক দিতে হয়। গান গাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে গেংগুলীকে এক বা একাধিক বোতল মদও দিতে হয়। এটি সম্মান হিসেবে তার প্রাপ্য। আবার অনেকে মদ খেলে গানে গলা খুলে যায় অর্থাৎ গলার স্বর মিষ্টি হয় বলে মনে করে।

পালাগান মূলতঃ কাহিনী ভিত্তিক। এতে বিভিন্ন প্রেমিক-প্রেমিকার স্নেহ, দুখ, মিলন, বিরহ ইত্যাদির কথা থাকে। চাকমাদের উভাগীতে সব ধরনের রসের সমাহার থাকলেও আদিরসের আধিক্য একটু বেশী বলে মনে হয়। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ শ্রোতাদের মধ্যে যুবকযুবতীদের সংখ্যাধিক্য। তারা প্রায়ই প্রেমের কাহিনী শুনতে চায়। আর তাই চাকমাদের জনপ্রিয় পালা-গানগুলির অধিকাংশই প্রেমগীতি।

উভাগীত বাঁশী অথবা বেহালা সহযোগে গাওয়া হয়। সচরাচর আধুনিক গানের সঙ্গে যেভাবে যন্ত্রসঙ্গীতও বাজানো হয়, উভাগীতে তা' করা হয় না। এতে গেংগুলী প্রথমে নির্দিষ্ট কোন পালাগানের কিছু অংশ গায়। তারপর সে গীতের সুরে বেহালা বা বাঁশী বাজায়। প্রয়োজনে গেংগুলী শ্রোতাদের বোধগম্যের জন্য গানের সাথে সাথে একটু আধটু অঙ্গভঙ্গী সহকারেও অভিনয় করে দেখায়। এতে কাহিনীর চরিত্রটি শ্রোতাদের কাছে ভালভাবে পরিষ্কৃত হয়ে উঠে। কাহিনীর চরিত্রটি পুরুষ অথবা মহিলা, শিশু অথবা বৃদ্ধ, হর্ষোৎফুল্ল অথবা ক্রন্দনরত, ভীত অথবা ক্রোধান্বিত, স্নেহময়ী অথবা বদরাগী গেংগুলীর কণ্ঠস্বরে সহজেই তা' বুঝা যায়। এ ছাড়া একই চরিত্রে একই কণ্ঠ ঢেলে, আর সেই কণ্ঠে চরিত্রটির রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদিও গেংগুলী ফুটিয়ে তুলে। নিম্নে চাকমাদের কয়েকটি জনপ্রিয় পালা-গানের নাম উল্লেখ করা গেল,

- ১। রাধামন-ধনপুদি
- ২। সনামন-পানপুদি
- ৩। নরধন-নরপুদি

- ৪। চাদিগাঙ ছাড়া
- ৫। লক্ষ্মী (পালা)
- ৬। তান্তাবী (পালা)
- ৭। কুগিকাবা বা চরামিত্তু (পালা)

এ গেল পালা গানের কথা, এবার কয়েকজন নামকরা গেংগুলীর নাম উল্লেখ করতে হয়। চাকমা গেংগুলীদের মধ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাজা ভুবন মোহন রায়ের আমলে “আকুয়া কানা” এবং বাত্যা গেংগুলীর নাম খুবই প্রসিদ্ধ। খ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর “চাবমা জাতি” গ্রন্থে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আকুয়াকানার নাম উল্লেখ করেছেন। আকুয়াকানা সম্ভবতঃ চাকমাদের তঞ্চঙ্গ্যাদলের লোক এবং জন্মান্ত ছিলেন।

কাহিনী : রাধামন-ধনপুদি

প্রেমের উপর চাকমাদের যতগুলি কাহিনী এবং পালাগান আছে সেগুলির মধ্যে ধনপাদা গ্রামের রাধামন ও ধনপুদি নামক দুজন প্রেমিক প্রেমিকার অনবদ্য প্রেম-কাহিনী নিয়ে রচিত পালাগান “রাধামন-ধনপুদি” একটি অনন্ত লোকগীতি।

এই পালাগানে অনেক খণ্ড এবং বিভিন্ন কাহিনী মূল কাহিনীর সাথে শাখা-প্রশাখার মত ছড়িয়ে আছে। নিম্নে কতগুলি খণ্ডের নাম দেওয়া গেল—

- ১। জুমকাবা, ২। রাত্তা বেড়া ৩। রাণী কুহুয়া, ৪। ঘিলাপাড়া,
- ৫। ঘিলাখারা, ৬। ফুলপাড়া ইত্যাদি।

আলোচ্য খণ্ডে ক্ষুদ্র পরিসরে এতগুলি খণ্ড একসাথে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ঐগুলি একসাথে লিখতে গেলে বিরাট এক একটা মহাকাব্য লেখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা সাত দিন সাত রাত গেয়েও “রাধামন-ধনপুদি” পালাগান ফুরানো যায় না। আলোচ্য পরিচ্ছেদে কেবল “ফুলপাড়া” খণ্ডের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ব্যক্ত করা হবে।

কাহিনী :

পূর্বকালে মেঘনা নদীর পূর্বতীরে ধনপাদা নামক গ্রামে মেনকা এবং কপুদি নামে ছ'বোন বাস করতো। কালে মেনকার সাথে জয়মঙ্গলের এবং কপুদির সাথে নিলগিরির বিয়ে হয়।

জয়মঙ্গলের আর্থিক অবস্থা ভাল এবং গ্রামে তাদের পরিবারের প্রভাব এবং প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। পক্ষান্তরে নিলগিরি এবং কপুদির অবস্থাও খুব একটা খারাপ নয়, মোটামুটি অবস্থাপন্ন বলা যায়।

বিয়ের পরে ছ'বোনের ছ'টি ছেলে মেয়ে হয়। মেনকার ছেলে রাধামন এবং কপুদির মেয়ে ধনপুদি। এ ছ'টি ছেলে মেয়ে শৈশব থেকে এক সাথে হেসে খেলে কৈশোর পেরিয়ে যখন যৌবনে উপনীত হলো তখনই এ কাহিনীর (ফুলপাড়ার) শুরু।

রাধামন গ্রামের যুবকদের নেতা। সারাদিন সে তার দলবল নিয়ে বনে জঙ্গলে, হাটে বাজারে, পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়ায়। তাদের সাথে কখনও কখনও গ্রামের যুবতীরাও দল বেঁধে যায়। ধনপুদি তার প্রেমিকা, রূপে যৌবনে, গুণে জ্ঞানে সারা দেশে (চম্পকনগরে) অতুলনীয়। সারা গ্রামের যুবকেরা তাকে দেখার জন্য এবং তাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার জন্য পাগল।

তার রূপের খ্যাতি যখন গ্রাম থেকে গ্রামে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো তখন শুরু হলো আসা বিয়ের প্রস্তাব। প্রতিদিন নিলগিরির বাড়ীতে ছেলেদের অভিভাবকেরা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ভিড় জমায়। বেচারী ধনপুদির তখন কাহিল অবস্থা। না জানি তার প্রেম কোথায় ভেসে যায়!

এদিকে তার মা (কপুদি) রাধামনকে মোটে দেখতেই পারে না। তার ধারণা, রাধামন একটা অপদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। সারাদিন বন জঙ্গলে টো টো ঘুরে বেড়ানোই তার কাজ। মেয়েটার (ধনপুদির) মাথা ওইই খাচ্ছে এই তার মায়ের ধারণা। মেয়েটাকে তিনি রাধামনের সাথে

মেলামেশার সুযোগ দিলেও কোনদিন ভুলেও তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন এ তিনি ভাবতেই পারেন না।

ভাগ্যের উপর কপুদির রাগের আরও একটা কারণ ছিল এই যে কেউ যদি ধনপুদির বিয়ের প্রস্তাব কারো পক্ষ থেকে নিয়ে আসে তবে রাধামন সারাক্ষণ লোকটার নিন্দা করে বেড়ায়। তার নিন্দায় এমনই ছল থাকতো যে ঐ লোকটা ছ'দিনেই বাপ বাপ করে পালাতো। জীবদ্দশায় আর কখনও বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ঐ মুখী হতো না।

একবার হলো কি আদিধন নামে ভিন্ন গ্রামের একজন যুগের ধনপুদিকে দেখে মনে ধরলো। সে তার পাণিপ্রার্থী হলো। আদিধনের বাবা ধনী। আর তাই ধনপুদির মায়ের তাকে জামাই করার জগা খুব পছন্দ হলো। কিন্তু বাষ সাধলো রাধামন।

সে বলে বেড়াতে লাগলো আদিধন আস্ত একটা বেকুব। তার নাম ভোলানাথ হওয়া উচিত। একবার বাজারে গিয়ে এক মশা মূতা তিন পয়সায় বিক্রি করেছে এতে বেপারীরা তাকে ঠকিয়ে খুব মজা পেয়েছে। আর একবার নাকি নিজেদের জুমে পাশবর্তী ছড়ায় (ছোট নদীতে) মাছ না কাঁকড়া ধরতে গিয়ে আদিধন পথ হারিয়ে জুমে উঠে একদল মেয়েকে দেখতে পেয়ে তাদেরকে প্রেম নিবেদন করতে যায়। কিন্তু জুমা ছিল তাদেরই। আর ঐ মেয়েগুলিও তার বোনই। পরে আদিধন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুব লজ্জা পায়।

এরপরও আদিধনের আগ্রহে যখন একটুও ভাটা পড়লো না। তখন রাধামন আরও নূতন তথ্য পরিবেশন করতে লাগলো। আদিধনের নাকি শরীরে সাংঘাতিক ধরণের খোসপাঁচড়া আছে। এমনকি ওগুলি হয়তে কুষ্ঠও হতে পারে। এ কারণে নাকি সঙ্গী সাথীরা তাকে ঘূমানোর সময় কখনও দলে নেয় না। কারণ বলাতো যায় না আদিধনের রোগব্যাধি থাকলে ওগুলি হয়তো ছোঁয়াচেও হতে পারে। তাই তারা নাকি রাতে আদিধন কোন বাড়ীর পিছনের

কক্ষে (ওজ্জেলিং-এ) শু'লে, সবাই ঐ বাড়ীর সামনের কক্ষে (চানা-তে) শু'তে যায়। এতেও নাকি আদিধন এক রাতে তার সঙ্গীদের বারোটা বাজিয়ে দিল। ঐ রাতে তার পেছাবের বেগ হলে আদিধন তাড়াহুড়াতে দিকভ্রাস্ত হয়ে ওদের কক্ষে এসে ভুলবশতঃ ঐ কক্ষকে খোলা মাচা (ইজর) মনে করে ওদের মাথায়ই পেছাব করে দেয়। সেই থেকে ভুলেও নাকি তারা আর আদিধনকে সঙ্গে নেয় না।

আদিধন সম্পর্কে এই সমস্ত আজ্ঞে বাজ্ঞে কথা শুনে ধনপুদির মন একদিকে যেমন ভয়ে দমে গেল তেমনি অন্যদিকে তার মা কুদির মন রেগে টং। যন্ত-সব জগাখিচুড়ি বানানো গল্প 'বোনপোর উপর তার রাগের সীমা রইল না।

কিন্তু এতসব রটনার পরও আদিধনের বাবা একদিন উপহার সামগ্রী নিয়ে বউ দেখতে এলেন। একটা কুলায় রাখা হলো বেশ কিছু বিনি ধানের চাল, পিঠা, নারকেল এবং অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য। একটা মদের বোতলও সঙ্গে আনা হলো। এ অনুষ্ঠানের নাম মদ পিলাং। রীতি অনুযায়ী আদিধনের বাবা এই মদ ধনপুদির বাবাকে দিলেন এবং তিনিও সাদরে গ্রহণ করলেন। এবার পাঞ্জী দেখানোর পালা।

কিন্তু ধনপুদির দেখা করার কোন নাম গন্ধ পর্যন্ত নেই। এ বিষয়ে যেন তার কোন কৌতুহলও নেই। তার মা ধনপুদির অনুপস্থিতির জ্ঞাত মনে মনে রেগে গেলেও বাইরে তা' প্রকাশ করলেন না। তিনি মেয়েকে বারবার আহুঁরে গলায় সেখানে আসার জ্ঞাত ডাকতে লাগলেন তাঁর বারংবার ডাকে ধনপুদি শেষ পর্যন্ত আলুথালু বেশে নোংড়া কাপড় চোপড় নিয়ে সেখানে এলো। আর এসেই উপহার সামগ্রীগুলি দেখতে না পাওয়ার ভান করে দিল নারকেল দু'টির উপর এক লাথি। তাতে নারকেল গুলি কুলা থেকে ছিটকে মাচাঘরের নীচে পড়ে গেল। আর পড়ার আগে ঐগুলি মদের বোতলে বাড়ি খেয়ে "মদপিলাং" এর মদটাই দিল নষ্ট করে। মদের বোতলটাও উন্টে গেল। উপস্থিত সবাই এ দৃশ্যে হা হা করে উঠলো।

তবে আদিচরণের বাবা তখনও আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। তিনি এটাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে ধনপুদিকে মা বলে কাছে ডাকলেন। এতে ধনপুদির বাবা নিলগিরি মেয়েকে তাড়াতাড়ি ভাবী শ্বশুরকে প্রণাম করতে বললেন। বাবার কথা মত ধনপুদি আদিচরণের বাবাকে প্রণাম করে “আজু” (মানে নানা) ডেকে বসলো। ছেলের ভাবী বউয়ের কাছে “নানা” ডাক শুনে আদিচরণের বাবার চোখ একেবারে ঠেকলো গিয়ে কপালে! তখন আর কি, ধনপুদির মা রেগে মেয়ের চুলের ঝুটি ধরে হিড়হিড় করে ছেঁচড়িয়ে তাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। আর এটি যে তার গুণধর বোনপোর কারসাজি তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তিনি তাঁর বোনপোর উপর আরও একধাপ ক্ষেপে গিয়ে আদিধনের সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি দৃঢ় চিন্তে পাকাপোক্ত করে ফেললেন। হাজার হোক ধনী-পাত্র, সহজে হাত ছাড়া করা যায় না। আর ধনপুদির রূপ এমনই যে অপমানটা হজম করেও আদিধনের বাবা এ বিয়েতে স্থির থাকলেন।

এ খবর শুনে রাধামনের মন দমে গেল। এত রটনা, এত ঘটনা করেও তার প্রচেষ্টা বার্থ হলো। সে বেচারী খুব বিষন্ন হলো। তাদের ছয়কুড়ি গেরস্তের গ্রামে নয়কুড়ি যুবকযুবতীদের মধ্যে তার মত দুঃখী আর কাউকে মনে হলো না। মনের দুঃখে সে উদাসী হয়ে একা একা নির্জন স্থান গুলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দুঃখে ধনপুদির সাথেও তার আর দেখা করার ইচ্ছা হলো না।

এদিকে ধনপুদির প্রেমিকা হৃদয়ও বিরহে ছটফট করছিল। একদিন রাতে আকাশে পূর্ণ চাঁদ উঠলো। চারিদিকে জোছনা, আলোর বজা। ধনপুদি বেরুল রাধামনকে খুঁজতে। কোথাও তার দেখা নেই। সঙ্গী-সাথীদের কেউ জানেনা সে কোথায় আছে। তাই বেচারী ধনপুদি অনেকক্ষণ একা একা খোঁজা-খুঁজির পর রাধামনকে নির্জন একটি স্থানে দেখতে পেল।

ঐ সময় ধনপুদির হাতে একটি অপরূপ ফুলের খণ্ডিতাংশ। আজ জুম থেকে ফিরার পথে সেটি তার মা পথে কুড়িয়ে পেয়েছে। এমন সুন্দর ফুল রাধামন

দেখেও দেখলো না। সে তখন সম্ভাব্য বিচ্ছেদের আশঙ্কায় বিমর্ষ হয়ে আছে। ধনপুদি তাকে পেয়ে একথা সেকথার পর ওরকম একটি ফুল পেয়ে দেবার জ্ঞা বায়না ধরলো। কিন্তু রাধামন ঐ ফুল চিনেনা। তাই ধনপুদির আবদার বিফল হলো। এতে ক্ষোভে, হুঃখে এবং অভিমানে ধনপুদির চোখ দিয়ে অশ্রু বেক্রতে চাইলো। অবস্থা বেগতিক দেখে রাধামন তার কথায় মনযোগ দিল।

আশৈশব ধনপুদি তার নিতাসঙ্গী। কখনও তার কোন আবদার পারতপক্ষে সে অপূরণ রাখেনি। কিন্তু ফুলটি তার অচেনা। তাই সে ধনপুদিকে বললো, “এ ফুল আমি চিনি না। জীবনে চোখেও দেখিনি। তুমি দাতুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো এ ফুলের কি নাম, কোথায় পাওয়া যায়।”

তাদের দাতু চলাবাপ, গ্রামের মোড়ল। নাতিনাতনীদেব সাথে ঠাট্টা মশকরায় তাঁর মত জুড়ি ঐ গ্রামে কেউ আর ছিল না। এমন জোছনা রাতে ধনপুদিকে এই অভিসারিণী বেশে দেখতে পেয়ে চলাবাপ ঠাট্টার সুরে বললো, “ওরে প্রিয়ে, শীগগীর এখান থেকে কেটে পড়ো। তোমার দাদী এই এলো বলে। আজ তোমার সাথে আমাকে দেখলে কাউকেই আর আস্ত রাখবে না”। তার এ কথায় ধনপুদি রেগে টং। দাতুর পিঠে হুঁ এক কিল বসিয়ে মনের ঝাল ঝেড়ে তবেই তাঁর কাছে আসল উদ্দেশ্যটা সে খুলে বললো। ফুলটির ব্যাপারে ধনপুদির অপরিসীম আগ্রহ দেখে চলাবাপ নাতনীর সাথে রঙ্গ করার জ্ঞা প্রথমে ঐ ফুলের নাম বলতে চাইলো না। এতে প্রথমে রাগারাগি, পরে অনুন্নয় বিনয় করেও যখন কাজ হাসিল হচ্ছিল না তখন ধনপুদি কান্নাকাটি করার হুমকি দিল। এতে কাজ হয়ে গেল। চলাবাপ তাড়াতাড়ি ঐ অচিন ফুলের নাম বললো, “নাকশা” মানে নাগেশ্বর। যার পাপড়ি ডিমের খোলার মত দপদপে সাদা, আর রেণুগুলিতে কুসুম-কোমল রঙ,—হলুদ।

চলাবাপ বললো, এই ফুল সুদূর মেঘনার তীরে সুউচ্চ পর্বতগাত্রেব বৃক্ষগুলিতে ফুটে। বৈশাখী ঝড়ে মেঘের সাথে হয়তো এটি উড়ে এসেছে। এ ফুল ধনপুদির জীবনে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেউ তার জ্ঞা অতদূরে ফুল ছিঁড়তে যাবে না। অতএব এ ফুলের আশা তার ত্যাগ করা উচিত।

চলাবাপ ধনপুদিকে এ ফুলের মায়া ছাড়ার জ্ঞাত যতই বুঝাতে লাগলো ততই সে এ ফুল পাবার জ্ঞাত উথলা হয়ে উঠলো। চাই চাই এ ফুল তার চাই। এ ফুল যদি চূলে গুঁজা না গেল তবে বুখাই এ জীবন। কিন্তু এ ফুল কে তাকে এনে দেবে ?

সে খণ্ডিত ফুলটি চূলে গুঁজে আবার রাধামনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। তখন মধ্যাকাশে পূর্ণ চাঁদ। নীচে অপরূপা পৃথিবী। আর ষোড়শী ধনপুদি। চূলে তার সেই অপূর্ব ছিন্ন ফুল, নাকশা!

কিছুক্ষণ পরে তার রাধামনের সাথে দেখা হলো। তারপর শুরু হলো ঐ ফুল পাবার জ্ঞাত কাকুতি মিনতি। কিন্তু মেঘনা যে অনেক দূর, রাধামন তাকে ঐ হুরাশা থেকে বিরত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ধনপুদি তার কোন কথাই শুনতে চাইলো না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে রাধামন ধনপুদিকে কথা দিল, এ ফুল সে তাকে মেঘনার তীর থেকে অবশ্যই এনে দেবে।

তবে রাধামন এত সহজে তার সে কথা রাখেনি। আজ যাবো, কাল যাবো করে চলে গেল অনেকদিন। ফুরিয়ে গেল অনেক সময়। ফুরিয়ে গেল ফুল ফুটা এবং ফুলেরও সময়। দিন গড়িয়ে দিন গেল। মাস ফুরিয়ে বছর গেল। ধনপুদির আর সে বছর চূলে ফুল গুঁজা হলো না। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল তার বিয়ের দিন। বিয়ে হবে তার আদিচরণের সাথে। তাই আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় হুজন প্রেমিক প্রেমিকার মুখে নেমে এল বিষাদের ছায়া।

এমনি ছাংখের দিনে তারা একদিন তাদের খেলার সাথী কুঞ্জধন-কুঞ্জবী, মেয়াধন-মেয়াবী, ছেয়াধন-ছেয়াবী, ফুজুকধন-ফুজুকবী, নিলংধন-নিলংবী কামেচধন-কামেচবী কে নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে দূর অরণ্যে গেল বাঁশ কোড়ল তুলতে, জুম থেকে শাক-সবজী (ত্যানপাত) কুড়াতে এবং পাহাড়ী ঝণার জলে “লুই” দিয়ে মাছ ধরতে। “লুই” হলো বেত দিয়ে নিমিত এক জাতীয় ত্রিকোণাকৃতি ফাঁদ।

মাসটা ছিল চৈত্র, ফুলের সময়। হঠাৎ ধনপুদির লুইয়ে মাছের সাথে ভেসে

উঠলো একটি ছিন্ন ফুলের পাপড়ি —সেই নাগেশ্বর ! বুকটা ধনপুদির ছলাৎ করে উঠলো । রক্তে শুরু হলো উন্মাদনা । মুখের ভাব বদলে গেল । আছে আছে নিশ্চয়ই এ ফুল কাছে পিছে কোথাও না কোথাও আছে । সে মরিয়া হয়ে রাধামনকে চেপে ধরলো আজ তাকে ফুল পেয়ে দিতেই হবে ।

রাধামন তাকে অনেক কষ্টে বুঝালো দাছ বলেছে এ ফুল কেবল মেঘনা তীরেই ফুটে কাছে পিছে কোথাও নেই । এ পাপড়ি হয়তো বৈশাখী ঝড়ে উড়ে এসে ঝর্ণায় পড়েছে । সে তাকে শাস্ত করার জ্ঞান বললো, “আগামী কাল আমি অবশ্যই তোমার জ্ঞান ফুল পারতে মেঘনা তীরে যাবো, সে যত দূরেই হোক ।”

তখন ধনপুদি রাধামনকে বললো, “তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, বসুমতীকে স্বাক্ষী রেখে আজ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, এ ফুল তুমি আমাকে অবশ্যই এনে দেবে ।” ধনপুদির এ কথায় রাধামনও বললো, “তবে প্রিয়ে, আজ তুমিও চন্দ্র, সূর্য্য, বসুমতীকে স্বাক্ষী রেখে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো । এ জীবন চলে গেলেও তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে না” । তখন উভয়ে সেখানে পরস্পরকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নেবার প্রতিজ্ঞা করলো ।

পরদিন তারা গ্রাম থেকে রওনা হলো দূরে দূরে অনেক ছুরে, - মেঘনার তীরে । অনেক পথ অনেক অরণ্য পেরিয়ে শুরু হলো পাহাড় উঠা, একটি ছ’টি নয় অজস্র ; ফুগন্তলী পর্বতমালা । সারাদিন অনেক কষ্টের পর তারা যখন পর্বত শিখরে পৌঁছলো তখন সেখান থেকে পূর্ব দিকে তাদের গ্রামগুলিকে ছবির মত দেখাচ্ছিল । আর পশ্চিম দিকে তাকিয়ে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল । বিশাল মেঘনা-সমুদ্র ! উত্তাল তার তরঙ্গমালা ! সৃষ্টির অপূর্ব বিস্ময় ! (যে যুগের কথা সে যুগে মেঘনা ছিল বিশাল সমুদ্রের মত ।)

শুরু হলো পাহাড় বেয়ে নামা । তারা যখন ফুলের কাছাকাছি পৌঁছলো তখন হৃপ্পুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় হয় । সূর্য ডুবু ডুবু । ফুলগুলি ছিল খুবই উচুতে । মেঘনা তীরে একটি শিলাময় গাত্রে অনেকগুলি গছে নাগেশ্বর ফুল বাতাসে

হুলছিল। ধনপুদির মনে ভয় হলো। অত উচুতে রাধামন যদি ফুল পারতে যায় তবে হয়তো তাকে একা পেয়ে বাঘভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে। সে মেঘনার জলের উপর তার জন্তু একটা জলটুকী বেঁধে দেবার জন্তু রাধামনকে বললো। রাধামন পাহাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে মেঘনার তীরে অগভীর জলে তিনটি বাঁশ পুঁতে তার উপর একটি মাচা তৈরী করে ধনপুদিকে পিঠে চড়িয়ে জলটুকীর উপর বসিয়ে দিল। সেখান থেকে ফুলগুলি ভাল ভাবে চোখে পড়ে।

রাধামন খাড়া পাহাড় বেয়ে গাছের উপর যখন উঠছিল তখন হঠাৎ দু'টি বাজমা পাখীর কথা বার্তায় রাধামন দৈববাণী শুনলো আজ যদি সে ধনপুদির নামে ফুল ছিঁড়ে নির্ধাৎ তার মৃত্যু হবে। একথা শুনে ভয়ে তার মনটা দমে গেল, সে গাছে চড়া বন্ধ করলো। এতে নীচ থেকে ধনপুদির মনে হলো, রাধামন হয়তো ভয়ে গাছে চড়তে চাচ্ছেনা। সে তাকে নীচে নেমে আসার জন্তু সন্তনয় করতে লাগলো। ধনপুদি বললো, ‘‘নেমে এসো প্রিয়। জগতে তোমার মত একটি ফুল থাকতে আমি আর কোন ফুল চাই না। বিধাতা যদি আমাকে জগতে একটি ফুলই বেছে নিতে বলেন সে ফুল তুমি। আমার আর অশ্রু ফুলের প্রয়োজন নেই।’’

এতক্ষণ ধরে রাধামনের মন জীবন ও মৃত্যুর দোলায় যেভাবে তুলছিল একথা শুনে হঠাৎ তা' থেমে গেল। তার মনে পড়লো তার প্রতিজ্ঞার কথা, ধনপুদিকে সে কথা দিয়েছে সে তাকে ফুল পেরে দেবে। তাতে যদি তার জীবন যায়ও তবু সে ধনপুদির জন্তু ফুল ছিঁড়বে। রাধামন আবার গাছে উঠা শুরু করলো।

কিছুক্ষণ পর ফুলগুলি নাগালের মধ্যে এসে পড়লো। প্রথমে সে দু'টি ফুল ছিঁড়ে নিল দাঁহু চলাবাপের জন্তু, তারপর তাদের আশৈশব সঙ্গী বাকী ছয়টি জুটির নামে ছয় জোড়া ফুল ছিঁড়লো। ঐগুলি ধনপুদিকে ছুড়ে দিল। সবচেয়ে সুন্দর ফুলগুলি দক্ষিণের ডালে। ঐগুলি তখন বাতাসে তুলছিল। ঐ ফুলই সে ধনপুদিকে দেবে। হঠাৎ আবার হৃদকম্প শুরু হলো। সে দৈববাণী—হয় জীবন, নয় মৃত্যু? একদিকে প্রেম অশ্রুদিকে মৃত্যু কোনটা সে বেছে নেবে?

এ ছ'য়ের সংঘাতে রাধামনের মনে হলো প্রেমের জ্ঞান মৃত্যুকেই বেছে নেওয়া শ্রেয়। সে ধনপুদির জ্ঞানে তড়িৎ গতিতে ছ'টি ফুল যেই ছিঁড়লো অমনি এতক্ষণ ধরে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটি বিষাক্ত সাপ রাধামনকে পায়ে ছোবল মেরে মেঘনার অঁধে জলে ফেলে দিল। ধনপুদির কানে শুধু এলো “বিদায় প্রিয়ে বিদায়!”

এ দৃশ্যে মেঘনার তীব্র শ্রেতে ধনপুদি ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্রোত তখন রাধামনকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। সে রাধামনের অচৈতন্য দেহকে যখন কূলে নিয়ে গেল তখন রাত্রি গভীর। চারিদিকে গভীর অন্ধকার। ক্রান্ত শ্রান্ত ধনপুদি বনের লতাপাতা এনে রাধামনের বিষাক্ত ক্ষতে লাগিয়ে দিয়ে বিধাতার কাছে সারারাত প্রার্থনা জানালো।

ভোর হতেই রাধামন চোখ খুললো প্রেয়সীর কোলে। সাগর জলে এবং বনের ঔষধে আশ্চর্যজনক ভাবে আপনিতাই বিষ নেমে গেছে। সে চোখ মেলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো, উর্ধ্বে উন্মুক্ত সীমাহীন আকাশ, সম্মুখে বিস্তৃত বালুকাময় মেঘনা তীর, শিয়রে অপরাধী নারী এক ধনপুদি, আর হাতে তার তখনও ধরে রাখা সেই ছ'টি ফুল।

সেও ছ'টি ফুল ধনপুদির হাতে তুলে দিল। তারপর তারা দুজনে গ্রামে যখন ফিরে গেল তখন ধনপুদির খোঁপায় গুঁজা রইলো সেই ছ'টি ফুল, অপূর্ব স্নানর,—পারিজাত।

এখানেই অবশ্য রাধামন ধনপুদি কাহিনীর শেষ নয়। এরপরও অনেক কাহিনী অনেক ঘটনা আছে। ওসব বাদ দিয়ে আমরা এবার ধনপুদির বিয়ের কথায় আসি।

দেখতে দেখতে একদিন এলো ধনপুদির বিয়ের দিন, পরম আকাঙ্ক্ষিত রাধামনের সাথে নয় আদিচরণের সাথে। যথারীতি তাকে বউ সাজানো হলো। স্বর্ণালঙ্কারে, পোশাকে-আশাকে বলমলিয়ে উঠলো তার রূপ। আদিচরণের সাথে বিয়ে। দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে একটি শুভ্র কাপড়

দিয়ে জোড় বেঁধে দেওয়া হলো। আর মাত্র একটি অনুষ্ঠান বাকী-- চুঙুলাং পূজা। এটিই বিয়ের শেষ এবং চূড়ান্ত অনুষ্ঠান।

চুঙুলাং পূজায় যথারীতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে শূকর কাটা হলো। পূজায় বলি দেবার জন্তু একটি মোরগ ও দু'টি মুরগীও আনা হলো। এবার কনের নদীতে গিয়ে স্বহস্তে এক কলসী জল আনা দরকার। ধনপুদি কলসী নিয়ে জল আনতে গেল। জল নিয়ে সে বাড়ীতে উঠলো তবে বিয়ের বাড়ীতে নয় রাধামনদের বাড়ীতে।

তারপর আর কি, চারিদিকে হৈ চৈ, অনেক নালিশ সালিশ ইত্যাদির পর শেষ পর্যন্ত তার রাধামনের সাথেই বিয়ে হলো।

[* আলোচ্য কাহিনীটি Hutchinson সাহেব তাঁর Chittagong Hill Tracts Gazetteer (1909) গ্রন্থে ছাপিয়েছেন। কিন্তু তার এই কাহিনী বর্ণনায় একস্থানে একটি মারাত্মক ভুল আছে। তা' হলো তিনি সরাধন নামে একজন ব্যক্তিকে রাধামনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ধনপুদির প্রেমাকাজক্ষী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সরাধন, রাধামনেরই ঔরষে ধনপুদির গর্ভজাত সন্তান।]

আধুনিক সাহিত্য :

চাকমা আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে খুব বেশী বলার এখনও সময় আসেনি। আলোচ্য গ্রন্থে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৭০ ইংরেজীর পর থেকে চাকমা তরুণদের প্রচেষ্টায় চাকমা আধুনিক সাহিত্য তার পথ যাত্রা শুরু করে।

সত্তরের দশকে বেশ কিছু কবিতা ও গান চাকমা ভাষায় রচিত হয়। কয়েকটি নাটকও মঞ্চস্থ হয় এবং ঐ সময় গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠীর কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পী জুম্নতা ও বিজুনতা নামে যে নৃত্যগুলি সৃষ্টি করেছিলেন তা' আজও দর্শকদেরকে আনন্দ দিচ্ছে।

আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি গান ও কবিতা বঙ্গানুবাদসহ দেওয়া হবে। তৎপূর্বে মঞ্চস্থ নাটকগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য নিম্নে দেওয়া গেল,

১। ধোঁতা বৈত (শয়তান ওঝা) :

লেখক—ননাধন

মঞ্চস্থ—১৯৭৮ ইং, রাঙামাটি।

বিষয়—তত্ত্বমন্ডের প্রতি ব্যঙ্গ করে রচিত একটি প্রহসন।

ধর্মীয় নাটক।

২। নীল মোন' সবন (নীল পাহাড়ের স্বপ্ন) :

লেখক—ননাধন

বিষয়—ব্লু মাউন্টেনের দুর্ধর্ষ লুসাই ও পয়দের শৌর্ধ, বীর্য, শিকার ও স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তির উপর রচিত।

৩। হয় নয় বৈজ্ঞ (হাঁ না ওয়া) :

লেখক ডাঃ ভগদত্ত খীসা

মঞ্চস্থ—১৯৮২ইং, রাঙামাটি।

বিষয়—বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মালিয়ারের গেঞ্জালিস নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত একটি চাকমা নাটক।

৪। আনাত ভাখি উধে কা মু (আয়নায় ভেসে উঠে কার মুখ) :

লেখক—চিরজ্যোতি -

মঞ্চস্থ—১৯৮৩ইং, রাঙামাটি।

বিষয়—আধুনিক চাকমা সমাজের বিবাহ সমস্যা।

১. ক। কবিতা :

কোনদিন ফিরি এম মুই

(স্বর্গীয় কবি জীবনানন্দ দাশতুন কমা চেইনে)

—ননাথন

আর কোনদিন ফিরি এম মুই
 এ দেবার গাঙ' কূলে কূলে
 ভুলং ছবার ছেরে ছেরে—
 হয়দ মানুচ নয়, হয়দ বা গাঙচিল,
 নয়দ বাগী পেগোর ভেচ ধরি।
 বরগাঙ, চেঙী, কাজলঙর পারে পারে
 আম কান্তোল গায়ে ঘিরা আদামানির,
 মজাঘরর শনচালর তলে তলে
 চেঙী শালর ধাঘে ধাঘে
 হাঝিখুঝি মুয়ানি চেই চেই—
 ম' ঘরত ফিরি এম মুই।
 মোনে মোনে মুরায় মুরায় তারেঙে কিজিঙে
 যে সুঘ' দিনুন মর হারেই যিয়ন
 সে দিনুন তোগেই তোগেই—
 সঙ ভুইয়র তুতুকা পধর ধাঘে ধাঘে
 ধূপ নাত্-ভুইয়ানির ফাঙন মাঝর—
 দঘিন বুইয়রর পিবির পিবির হাবায় হাবায়,
 বুক ভরন নিঝাচ টানি টানি
 ধারাদিয়ালী চোষপানি-লই
 ম' ঘরত ফিরি এম মুই।

সেকে বেলান নুয়া আঝার সদক ফেলিব,
 ভিজা ভিজা মাড়িয়ান শুগা ধরিব ;
 আমা মিলাগুন মেগামেগি চলাচলি গরি
 সরে সরে নাজি নাজি হাদিবাক,
 পিমোন' কাজা পেগত বুরে বুরেই পানি তুলিবাক ।
 কুজি কুজি হেল্ হেল্ ধান চালাগুন
 দঘিন' বইয়ারত হেলোনি কেলোনি খেই
 ন' ঠ্যাঙত আঝারে আঝারেই পরিবাক
 মুই মর পুরানা আদামত ফিরি এম ।

* ১ম প্রকাশ : জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর (জুভাপ্রদ) । সংকলন—জুনি,
 (১৯৭২ইং) পৃঃ—১ । ননাধনের প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ : রঙধঙ (১৯৭৮ইং)।

অনুবাদ :

আর কোনদিন ফিরিয়া আসিব

(স্বর্ণীয় কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি কৃপা চেয়ে)

আর কোনদিন ফিরিয়া আসিব এ দেশের গাঙের কূলে কূলে
 কাশবনের ফাঁকে ফাঁকে, হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা গাঙচিল,
 নয়তো “বাগী” পাখীর বেশে ।

কর্ণফুলী, কাসালঙ, চেঙীরা পারে পারে

আমকাঠালে ঘেরা শান্ত গ্রামের,

মাচাঘরের শনচালের তলে তলে ঢেঁকিশালের পাশে পাশে

হাসি খুশী মুখগুলি চাহিয়া চাহিয়া—

আবার আসিব ফিরে আমার আপনার নীড়ে ।

পাহাড়ে পাহাড়ে শিখরে শিখরে বিজনে নিরঞ্জে

আমার সোনার দিন হারাইয়া গিয়াছে,

তাহাদের সব খুঁজিয়া ফিরিব বালুময় ধূ ধূ পথ বেয়ে ;
 হ'ধারে রহিবে পড়ে ছায়া ছায়া ফেলে-যাওয়া জুমে'র অঞ্চল ।
 হয়তো তখন দখিনা হাওয়া বহে যাবে তীব্র বেগে
 হু হু করে জুমে'র পাহাড়ে, বুক ভরা শ্বাস নিরা
 ফিরিয়া আসিব আমি আমার আপনার পুরাতন ঘরে ।
 হয়তো তখন ভোর, নূতন দিনের সূর্য আলো
 কুমারী-কোমল পেলব মাটিতে করিবে খেলা,
 কণ্ঠফুলীর তীরে তীরে অগণিত কিশোরী সকল
 চঞ্চল হাওয়ায় উড়ে চুল, উড়ে মন,
 পেলব মাটির কোমল ফ্রেড়ে ডুবে রাস্তা পা .
 ডুবে কিশোরীর নূতন "পিনোন"-পাড় ।
 হয়তো তখন দখিনা হাওয়া বহে যাবে
 ধান-শিশুদের শীর্ষে শীর্ষে, তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিবে তাহারা
 লুটায় পড়িবে আমার চরণে—
 আমি আবার আসিব ফিরে সেদিন আমার পুরাতন গ্রামে ।

* "কোনদিন ফিরি এম মুই" কবিতাটির অনুবাদ ।

"বার্গো"—একজাতীয় পাখী । পিনোন—চাকমা মেয়েদের নিম্নাঙ্গে পরণের কাপড় ।

২. ক । কবিতা :

জন্মবী পরাণী মর

—ফকলাজিয়া

সাগরর পানি তর চোখ' ভর

এও যে এধক আছে, ন ইধ জানং মুই ;

ন হুধ জানং মুই কমলে হারেলে তুই

বডাচোঘী, নুদীচোক, নুদীহাঝি,—

কুজি কুজি হুদী হুদী রিনিচানাঘান।

জুম্বী, কধেই চাং, এধক কেঙোরি হলে

পোঝাগে আ' ধগেধাগে কধা কধে

বাঙাল মিলা সান ?

আ মর পরাণর চম্পকনাগরী !

কধেই চাং কমলে কেঙোরি কধু

তর মর এধক দিন হইয়ে হারাহারি ?

মোনমুরা ছড়াছড়ি কদ কিত্যা ঘুরিফিরি

চিম্মুরেপা আবধা গোরি

ভালোকদিন পরে তুই ম' ইধু এলে।

কধেই চাং জুম্বী পরাণী মর, এধক দিন কধুকধু এলে ?

ভালোকদিন পরে তুই ম' ইধু এলে।

আঘেনি ঈদত তর, তর মর সুদিনর পরাণর—

নানা কধা নানা গীত নানা রঙধঙ ?

অলেক্সা ডুবের বেল, বেলপুগে ডগর্ডন,—

গায় গায় তুই এযর সাঝুগ্গার লাঙেলর জুমপথ ধরি ;

অলেক্সা কইয়ং তরে, কি আনর ম' পরাণী কালোংডুয়াত গরি ?

সেক্ষেস্তা মরর লাজে আষচ তুই মাধা নিউরি।

আঘেনি ঈদত তর মোনঘর জুন'পহর বাঝীলই শিঙালই-

ধুধুগর র ?

আঘেনি ঈদত তর কুজি কুজি মনকানানি খেংগরঙর র ?

আঘেনি ঈদত তর, মোন'মাধা ধুম' ইধু কবরগ' জুম ?

ক্কাগ্গায় বাচে থেই সাঙু কিত্যা চেই চেই—

এলনি সেক্ষে তর দিচোঘত ঘুম ?

নেই নেই নেই—

নেই এচা রাধামন, সেনতায় নেই ধনপুদী ।

বানা আঘি তুই মুই এধকদিন সং,

কি হব ভাবিনেই আর সেইদিন সেই সুখ সেই রঙধঙ ।

সেনতায় কং তরে, ন কানিচ তাত্তাবী গাবুরী ধক,

ন হাঝিচ চান্দবীর জুঘ' হাঝিয়ান ;

চুলানত গুজা ফুল, ধরমর গোরি পিন্—

পরানর হাওঝর ঝিঙাফুল চাবুগীর নুয়া পিনোনান,

হাঝি হাঝি দোলেদালে বান্ তুই রাঙা ঝাদিয়ান ।

সেনতায় কং তরে, তুই হবে ধনপুদী মর,—

হোম মুই তর রাধামন ।

তারপরে রেস্তুয়া গেলে পহুর হলে—

দেবে তুই বেল উধের, জুমজুয়া সুদাফুল হাঝং হাঝং,—

মনে হব ফিরি এচো হারামিয়া তরমর—

পুরানর সুদিনর নানা কথা নানা সুখ নানা রঙধঙ ।

* ১ম প্রকাশ : জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর, সংকলন-বার্গী, ১৯৭৩ ইং,
পৃ: ২-৩ ।

অনুবাদ :

জুম্বী প্রিয়া মোর

সাগরের এত জল ছুঁটি চোখে এখনও এত যে আছে,

হায় আমি তা জানিনা !

কবে তুমি স্নানয়না, হারিয়েছ প্রিয় আঁখি, মায়া চোখ—

শ্যামল-কোমল-চাহনী ?

জুম্বী, বল প্রিয়া, সাজে লাজে কেন আজ কাঙালিনী বেশে ?

আহা মোর চম্পা-প্রিয়া, কত কাল পরে দেখা হলো দুজনের !
 কত পথ, কত নদী, কত গিরি, কত অরণ্য পেরিয়ে—
 আবার এসেছ হায় এতদিন পরে ।

মনে পড়ে ?

দু'জনার সুদিনের কত হাসি কত গান ছিলো ।

ছিলো কত ভালবাসা ।

হয়তো একদিন অস্ত্রাচলে রবি, চারিদিকে ঝিঁঝিঁ ডাক,—

তুমি একা নেমে এলে জুম পথ বেয়ে ;

হয়তো দু'জনার হয়েছিলো দেখা,—

বলে ছিন্ন, কি আছে ঝুড়িতে তোমার প্রিয়া ?

তুমি হ'লে নত-আঁখি লজ্জা-রাঙা—সেদিন সূর্যাস্তে একাকী

একান্তে আমার মুখোমুখি ।

নেই নেই নেই, নেই আজি রাধামন, তাই নেই ধনপদী ;

শুধু আছে দু'টি প্রাণ কোনক্রমে বেঁচে ;

কি হবে ভেবে আর সেই দিন, সেই সুখ, সোনার হরিণ ?

তাই বলি প্রিয়া, মুছে ফেলে ~~সব কথা~~, বিবাদের হাসিটুকু ;

চলে আজ গুঁজো ফুল, পরো আজ নতন পিনোন,

বুকে বাঁধো রাঙা-খাদি—

আমি আজ হই তবে রাধামন, তুমি হবে ধনপুদি ।

তারপরে রাত গেলে ভোর হলে পূর্বাকাশে দেখা দেবে নুতন

সূর্যোদয়,

রাশি রাশি তুলা ফুলে শিশিরে শিশিরে—

ভরে যাবে জুমের অতল,

মনে হবে ফিরে এলো ঐ বুঝি আমাদের সুখের সময় ।

৩. ক। কবিতা :

ম' মরানা পর

— দীপংকর শ্রীজ্ঞান

ম' মরানা পর শিধান' জানালা খুয়েই দিচ,
 পিবির পিবির হাবা এখ চেলে এবার দিচ ।
 বুইয়ার' ঝলগত পাদা ঝরি যদি
 সোমেবার চায় ভিদির' গুধি
 সোমেবার দিচ সোমেই যোক,
 ফুল বাগানত ঝড় যদি উধে উধিই যোক
 কালা হুলে আর পহর ন ফুড়ে নয়ো ফুডোক ।

মেঘে মেঘে যদি দেবা ঢাগি যায়
 গুরুং গুরুং র নিঘিলায়
 গুগুনা বৃগর তিরোখ' হুয়ার
 হাবাংপাং খুয়েই যেবার
 পথ গরি দিচ খুয়েইয়া থোক,
 মনান যদি চিগুত্ পরে চিগুত গরোক ।
 ভাঙি পড়িনেই কানানি এলে
 ধারা-দিয়ালী ঝরিনে পলে
 চোষ' পানিনি লামিদ চেলে
 ঝড় ফুডা ধক লামিবার দিচ লামি যোক,
 চিদত্ত যদি পুড়ানা সময় চিত পুডোক ।



* কবিতার রচনাকাল : ১৯...ইং । ১ম প্রকাশ : জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর, গ্রন্থ—পাদারঙ কোচপানা (১৯৭৮ইং), পৃঃ—৯ ।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রকাশিত গ্রন্থ : ফুরামোন (১৯৭৩ইং), পাদারঙ কোচপানা (১৯৭৮ইং), অন্তর্গত বৃষ্টিপাত (১৯৭৭) রুশ ভাষায় বাংলাদেশের কবিদের প্রথম যে কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয় তাতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কবিতাও স্থান পেয়েছিল ।

অনুবাদ :

আমার মৃত্যুর পরে

আমার মৃত্যুর পরে শিখানের জানালা খুলে দিও,
ফিরফিরিয়ে হাওয়া এলে আসতে দিও।
ঝঞ্ঝার বেগে পাতা ঝরে যদি
প্রবেশের পথ খুঁজে খুঁজে মরে আসতে দিও আশ্রুক,
ফুল বাগানে ঝড় যদি উঠে উঠতে দিও
কালো হলো আর আলো ফুটবেনা নাইবা ফুটুক।

মেঘে মেঘে যদি দেয়া ঢেকে যায়
আকাশের বৃকে বিজ্যৎ চমকায়
তৃষিত বৃকের তৃষ্ণার দ্বার খুলে দিও খুলেই থাক,
ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে থাক হাওয়া
ধূয়ে মুছে দিক হৃদয়ের চাওয়া
কাদে যদি প্রাণ আপনার লাগি কাদতে দিও সে কাঁচুক।

ভাঙে যদি মন হারানোর শোকে
নামে যদি জল ছখী আঁখি হতে
নামতে দিও সে নাশুক,
মনে যদি পড়ে হারানোর স্মৃতি
কাদতে দিও সে কাঁচুক।

১. খ। গান :

জুম্বী কমলে হাদিবে ম'ধাঘত

—নলাথন

জুম্বী কমলে হাদিবে ম' ধাঘত
 কমলে ত' গাঙান মিঝিব ম' গাঙত ॥
 কোনদিন দ্বিজনে হাদি যেই বিজনে
 গাঝ' ছাবাত বই—
 দিনবুয়া কাদেবং চোঘে চোক রিনি চেই
 বানা কথা কই
 ছাড়ি দিনে ত' চুলান পড়ি রবে ম' বুগত ॥
 কোনদিন দ্বিজনে এ দেবত বানিবং
 আমি ঘর—
 সারা রাত যদি ঝরে আগাঝর
 জুন' পহর
 সাগরর কোচপানা লইনে তুই থিয়েবে মুজুঙত ॥

অনুবাদ :

জুম্বী কবে তুমি হাঁটেবে মোর পাশেতে
 কবে তোমার নদীটি মিশবে আমার নদীতে ॥
 কোনদিন তু'জনে হেঁটে গিয়ে বিজনে
 তরু ছায়ায় বসবো
 সারাদিন তু'জনে চোখে চোখ রেখে
 শুধু কথা বলবো
 খুলে দিয়ে কবরী শুয়ে রবে বুকোতে ॥
 কোনদিন তু'জনে এদেশে
 বাঁধবো একটি ছোট্টঘর—
 সারারাত যদি ঝরে
 আকাশের টাঁদনী কর
 সাগরের ভালবাসা নিয়ে তুমি দাঁড়াবে স্নমুখে ॥

* জুম্বী ভাষা প্রচার দপ্তর, বিজুগুলা (১৯৭৭), পৃ: ১

২. খ। গান :

উর্জন পেগে মেঘে মেঘে

— অমর শান্তি

উর্জন পেগে মেঘে মেঘে মেউলা দেবা তলে
ম' পরানান যেদ মাগে তারা লগে লগে ॥
চেরে কিত্যা নানান পেগে উড়ি উড়ি গীত গাদন
সেই গীদেদি মন ভুলিনেই ফুল ফুডি যাদন
গেছং চাদে গেই ন পারং তারা ধগে ধগে
ম' পরানান যেদ মাগে তারা লগে লগে ॥

এই দেবর মুরায় মুরায় গাঝ' বাঝ' তাকুম বন
চাল-সিলেইয়া ধোক্যা গরি চাদে লাগে গম
ঝারত সোমেই এগা মনে গায় গায় গরি বেড়়েলে
ম' পরানান যেদ মাগে তারা লগে লগে ॥

অনুবাদ :

উড়ছে পাখী মেঘে মেঘে মেঘলাকাশের নীচে
আমার মন যেতে চায় তাদের সাথে সাথে ॥
চারিদিকে নানা পাখী উড়ে উড়ে গীত গায়
সেই গীতে যে মন ভুলিয়া ফুল ফুটে যে যায়
গাইতে চেয়েও পারিনাকো তাদের মত গাইতে
আমার মন যেতে চায় তাদের সাথে সাথে ॥

এই দেশের পাহাড়েতে গাছে বাঁশে তরু-বন
জড়াজড়ি হয়ে সবে দেখতে লাগে শোভন
আপন মনে বনপথে একা একা বেড়ালে
আমার মন যেতে চায় তাদের সাথে সাথে ॥

* গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠি, শিঙ্‌গা (১৯৭৫ ইং)

৩. খ। গান :

এতে এল এক রাজা

—রাজা দেবশীষ রায়

এতে এল এক রাজা বিজয়গিরি তার নাঙ

সাত চমু সৈন্য লই ছ' দিন ছ' র়েত—

পার হল তে এক বরগাঙ ॥

তেওয়া গাঙ' পারত কালাবাঘা নাঙ' দেখত

কুরেল তে চেরবুয়া পণ্ডিত মানুচ জন

আর নানা জাদর হাত্যার রসদ ॥

ইন্দং ক্রিন্দং টেকনাফ তিন দেখত

পাখেল তে বীর সেনাপদি,

লারেয়র জয় শুনি গেল তে উজানি

ন য়েবং ভেইলক পিঝেন্দি ।

চম্পকনগরত বুড়া রাজা মরি গেল

হল রাজা ভেই সমরগিরি,

কল রাজা বিজয়গিরি ন য়েবং আর ফিরি

বেঘে মিলি নুয়া দেচ গরি ॥

অম্বুবাদ :

এক য়ে ছিল রাজা বিজয়গিরি তার নাম

সাত চমু সেনা নিয়ে ছয় দিন ছয় রাত

পার হলেন বহু গিরি নদনদী দেশগ্রাম ॥

তেওয়া গাঙের পারে কালাবাঘা দেশে

কুড়োলেন বহু সেনা, হাতিয়ার, রসদ—

আর চার জ্ঞানী শেষে ॥

ইন্দং ক্রিন্দং টেকনাফ তিনদেশে পাঠালেন বীর সেনাপতি,

চারিদিকে জয় বিজয়ের বার্তা শুনে এগোলেন নরপতি ।

চম্পকনগরে বুড়া রাজা মারা গেলো হলো রাজা

ছোট ভাই সমরগিরি,

দেশে আর যাবো না বললেন বিজয়ী

এসো সবে নব দেশ গড়ি ॥

গ্রন্থপঞ্জী :

- ঘোষ, সতীশ চন্দ্র ১৯০৯ ইং : চাকমাজাতি, কলিকাতা ।
- রায়, রাজা ভুবন মোহন ১৯১৯ ইং : চাকমা রাজবংশের ইতিহাস, রাঙ্গামাটি ।
- চাকমা, মাধব চন্দ্র কন্মি ১৯৪০ ইং : রাজ্যনামা, চট্টগ্রাম ।
- চাকমা, নোয়ারাম ১৯৬২ ইং : পার্বত্য রাজলহরী, রাঙ্গামাটি ।
- দেওয়ান, বিরাজ মোহন ১৯৬৯ ইং : চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি ।
- দেওয়ান, কার্মিনী মোহন ১৯৭০ ই : পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের
জীবন কাহিনী, রাঙ্গামাটি ।
- চাকমা, সুগত ১৯৭৫ ইং : চাকমা বাঙলা অভিধান, রাঙ্গামাটি ।
- চৌধুরী, ছলল ১৯৮০ ইং : চাকমা প্রবাদ, কলিকাতা ।
- সেন, কালীপ্রসন্ন ১৯২৭—৩৫ ইং : রাজমালা (৩ লহর) আগরতলা, ত্রিপুরা ।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র ১৯৮১ ইং : বাংলাদেশের ইতিহাস (৭ম, সং)
কলিকাতা ।
- চাকমা, নোয়ারাম ১৯৫৯ ইং : চাকমার পঞ্চম শিক্ষা, চট্টগ্রাম ।
- চাকমা, দীপঙ্কর ক্রীষ্টান ১৯৭৪ ইং : পাদারঙ কোচপানা, রাঙ্গামাটি ।
- চাকমা, ননাধন ১৯৭৮ ইং : রঙধঙ, রাঙ্গামাটি ।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ১৯৮২ ইং : উপজাতি গবেষণা পত্রিকা
(১ম সংখ্যা), রাঙ্গামাটি ।
- রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরী ১৯৮১-৮২ ইং : অক্ষর (১ম ও ২য় সংখ্যা) ।
- জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর ১৯৭২ ইং : জুমি, রাঙ্গামাটি ।
- ১৯৭৩ ইং : বাগী ।
- গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠী ১৯৭৫ ইং : শিক্ষা, চট্টগ্রাম ।
- উন্মাদ শিল্পী গোষ্ঠী ১৯৮১ ইং : ছয়াঙ ছেরে চাঙমা গীত,
রাঙ্গামাটি ।

- Lewin, T. H. 1869 : The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein, Calcutta.
- Lewin, T. H. 1912 : A Fly on the wheel, London.
- Hutchinson, R. H Sneyd 1906 : An Account of the Chittagong Hill Tracts, Calcutta.
- Rajput, A. B 1963 : The Tribes of Chittagong Hill Tracts, Karachi
- Roy. Raja Bhuvan Mohan 1919 : History of Chakma Raj Family, Rangamati.
- Hunter, W. W. 1896 : Statistical Account of Bengal (Chittagong & Tripura), Calcutta.
- Cotton, H J. S. 1880 : Memorandum on the Revenue history of Chittagong, Calcutta.
- Islam, Sirajul 1978 : Bangladesh District Records Chittagong, Dacca.
- Bessaignet, Pierre 1959 : Social Research in East Pakistan, Dacca.
- Gait, E. T. 1906 : History of Assam, Calcutta.
- Basu, N. K. 1970 : Assam in the Ahom Age, Calcutta.
- Dalton, E T. 1872 : Tribal history of Eastern India, Calcutta.
- Chatterjee, S. K. 1974 : Kirata Jana Krti (2nd Ed.), Calcutta.
- Phayre, Arthur 1883 : History of Burma, London.
- Saigal Omesh 1978 : Tripura, Delhi.
- Goswami, B. B. 1979 : Mizo Unrest, Jaipur, India.
- Grierson, G. A. 1903 : Linguistic Survey of India, Calcutta.

- Chatterji, S. K. : The Origin & Development of the Bengali Language.
- Smith, Vincen 1961 : History of India (3rd. Ed.)
- Ali S. M. 1967 : Arakan Rule in 1967 J. A. S. P Voll-XII, No. 3
- Karim Abdul, 1963 : Samandar of the Arab geographers, J. A. S. P. Voll-VIII, No. 2
- Selections from the Correspondence on the revenue administration of the Chittagong Hill Tracts, 1887.
- Loffler, Lorenz G. 1969 : Chakma and Sak, Vo-L, No. I, Heidelberg.
- Bechert, Heinz 1967 : Educational Miscellany Vol. IV, No. 3 & 4
- Phayre, 1841 : An Account of Arrcan, J. A. S. B. Vol.-X, Part-I, Calcutta
- Loffler, Lorenz G. 1968 : A note on the history of the Marma Chiefs of Bandarban, J. A. S. P. Vol-XIII, No. 2, Dacca.
- Collins, Larry and Iappierre, Dominiqua 1982 : Mountbatten and the Partition of India, Dacca.
- Mackenzie, A. 1884 : The North East Frontier of India.
- Bessaignet, Pierre 1958 : Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts.
-



লেখক পরিচিতি :

সুগত চাকমা (ননাধন), জন্ম ২৪ শে মার্চ ১৯৫১ ইং,
রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ; চাকমা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে
একজন তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল লেখক - কবি।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

চাওমা বাওলা কথাতারা (অভিধান) ১৯৭৫ ইংরেজী।
রাঙ্গামাটি।

আল মনা চাকমা
রঙধনু (কাব্য গ্রন্থ) ১৯৭৮ ইংরেজী, রাঙ্গামাটি।

গবেষণা পত্র :

চাকমা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, ১৯৭৪ ইংরেজী, রাঙ্গামাটি।
Tribal Languages of Chittagong Hill Tracts,
1981. Rangamati,

মঞ্চস্থ নাটক (অমুদ্রিত) :

ধেঙাবৈদ্য, ১৯৭৮ ইংরেজী, রাঙ্গামাটি।

নীলমোন'সবন, ১৯৭৯ ইংরেজী, রাঙ্গামাটি।

মিঃ চাকমা বর্তমানে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট,
রাঙ্গামাটিতে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত আছেন।

